NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

[Applicable for HEC]

COMMERCE
[HCO]

GE-CO-31

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্তী
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
Subject : Honours in Commerce (HCO)
Course Code : GE-CO-31
পাঠক্রম: রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতি
Course : Principles of Political Economy
(Applicable for HEC)

প্রথম মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী, 2023
First Print : February, 2023

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
Subject : Honours in Commerce (HCO)
Course Code : GE-CO-31
পাঠক্রম: রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতি
Course : Principles of Political Economy
(Applicable for HEC)

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

অনির্বাণ ঘোষ
Director (i/c), SPS,
NSOU (Chairperson)

ধীরেন কোনার
Professor (Former) of Economics
University of Kalyani

সেবক জানা
Professor of Economics
Vidyasagar University

বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
Professor of Economics
NSOU

বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics, NSOU

সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics, NSOU

অসীম কুমার কর্মকার
Assistant Professor of Economics, NSOU

পূর্বা রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics
Bhowanipore Education Society

প্রিয়ম্থী বাগচী
Assistant Professor of Economics, NSOU

: রচনা :
সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics, NSOU

: সম্পাদনা :
বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
Professor of Economics, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :
প্রিয়ম্থী বাগচী
Assistant Professor of Economics, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ড. অসিত বরণ আইচ
নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

পাঠক্রম : রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতি

(Principles of Political Economy)

Course Code : GE-CO-31

[Applicable for HEC]

একক ১ ❑ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি 7-34

একক ২ ❑ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে অবস্থান্তর বা উত্তরণ 35-59

একক ৩ ❑ উত্তরণ বিতর্ক 60-68

একক ৪ ❑ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ 69-92

একক ৫ ❑ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি 93-109

একক ৬ ❑ রাষ্ট্রের ভূমিকা 110-135

একক ১ ❑ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সামন্ততন্ত্র

১.৩.১ সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.৩.২ সামন্ততন্ত্রের গুণ

১.৩.৩ সামন্ততন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি

১.৪ ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ

১.৪.১ ধনতন্ত্রের উৎপত্তি

১.৪.২ ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.৪.৩ ধনতন্ত্রের গুণ

১.৪.৪ ধনতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি

১.৪.৫ ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্ক্সের অভিমত

১.৫ সমাজতন্ত্র

১.৫.১ সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.৫.২ সমাজতন্ত্রের গুণ

১.৫.৩ সমাজতন্ত্রের দোষ

১.৬ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তুলনা

১.৭ সারাংশ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়
- সামন্ততন্ত্রের দোষগুণ
- ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা
- সমাজতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা

১.২ প্রস্তাবনা

আমরা জানি, কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন রকমের উপাদান লাগে। সেগুলি হল: জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম এগুলি নিয়োগ করে উৎপাদন করে। তারপর সেই উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে ফার্ম পায় রেভিনিউ। সেই রেভিনিউ আবার উৎপাদনের উপকরণ বা উপাদানগুলির মালিকদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। এই উৎপাদন ও বণ্টনের সামগ্রিক কাজকর্মের সঙ্গে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন জড়িত। এক, কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে? দুই, কীভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে? তিন, কাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে? এই তিনটি সমস্যাই কোনো দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল সমস্যা। একদল মনে করেন যে, এইসব প্রশ্নের সমাধান বাজার ব্যবস্থার হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। বাজার ব্যবস্থাই সম্পদের কাম্য বণ্টন ঘটিয়ে দেশের দেশের উৎপাদন সর্বাধিক করবে। আর একদল মনে করেন যে, সব কিছু বাজার ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিলে অর্থনীতির দক্ষ এককেরাই সবকিছু আত্মসাৎ বা দখল করবে এবং তুলনায় অদক্ষ বা দুর্বল এককেরা বঞ্চিত হবে। সুতরাং, কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই উৎপাদন ও বণ্টনের সমস্যাটির সমাধান করা উচিত। এই উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপন্নের যথাযথ বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করাই রাজনৈতিক অর্থনীতির কাজ। সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক অর্থনীতি হল মানবসমাজে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিনিময় সংক্রান্ত নিয়মাবলির বিজ্ঞান। এই অর্থনীতি শুধু কোনো দেশের উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাকেই ব্যাখ্যা করে না, সেগুলির উপযুক্ত পরিবর্তনের পথও নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক অর্থনীতির ইতিহাস বেশ প্রাচীন। উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়মকানুন কেমন হবে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল-এর (খ্রীষ্টপূর্ব 384-322) লেখায় পাওয়া যায়। ভারতের মৌর্যযুগে চাণক্য বা কৌটিল্যের (খ্রীষ্টপূর্ব 375-283) অর্থশাস্ত্রে বাণিজ্য, মুদ্রা, সুদবহনকারী পুঁজি (interest bearing capital) প্রভৃতির আলোচনা আছে। এই সমস্ত লেখাগুলি থেকে বিভিন্ন দেশ ও

ঐতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির আভাস পাওয়া যায়। এখন, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন। স্বভাবতই, উৎপাদন ও বণ্টন বা বিনিময়ের নিয়ম দেশ ও কালভেদে আলাদা হয়। এঙ্গেলস বলেছেন, "যে পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ উৎপাদন ও বিনিময় করে তা দেশ থেকে দেশান্তরে এবং একই দেশের অভ্যন্তরে কাল থেকে কালান্তরে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং সমস্ত দেশ ও ঐতিহাসিক কালে রাজনৈতিক অর্থনীতি একইরকম হতে পারে না। রাজনৈতিক অর্থনীতি তাই প্রকৃতই একটি ঐতিহাসিক বিজ্ঞান।" সুতরাং, সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে চিন্তানায়কেরা উৎপাদন ও বিনিময় সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অর্থনৈতিক রীতিবদ্ধ আলোচনা আমরা প্রথম পাই সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে। ঐ সময়ে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক মতবাদ প্রসার লাভ করে, তা হল বাণিজ্যবাদ (mercantilism)। এই বাণিজ্যবাদীরা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং শিল্পের উপর জোর দিতে বলেছেন। সরকার যেন এই দুই ক্ষেত্রকে নানা সুবিধা দেয়, তার জন্য সুপারিশ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে কেনে-র (Quesnay) নেতৃত্বে প্রচারিত হয় প্রকৃতিতন্ত্রবাদ (physiocracy)। এই প্রকৃতিতন্ত্রবাদীদের (Physiocrats) মতে, দেশের সম্পদের বড় অংশই কৃষিতে নিযুক্ত করা উচিত কারণ কৃষিক্ষেত্রই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম— শিল্প বা বাণিজ্য ক্ষেত্র নয়। তাঁরা ছিলেন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোনো রকম হস্তক্ষেপ বা বিধিনিষেধের বিরোধী। এক কথায়, তাঁরা ছিলেন অবাধ নীতির (laissez faire policy) সমর্থক। এই অবাধ অর্থনীতির সমর্থন করেছেন পরবর্তীকালে অ্যাডাম স্মিথ যাঁকে আমরা অর্থনীতির জনক বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। তবে প্রকৃতিতন্ত্রবাদীদের ন্যায় তিনি উন্নয়নের জন্য কৃষির উপর গুরুত্ব দেননি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্মিথ শিল্প ও বাণিজ্যের উপর জোর দিতে বলেছেন। আর বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভর করেছেন বাজার ব্যবস্থার উপর অর্থাৎ তিনি কোনো বন্টন নীতি প্রদান করেননি।

স্মিথের পরে বিখ্যাত ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ হলেন ডেভিড রিকার্ডো। তিনি তাঁর বিখ্যাত "Principles of Political Economy and Taxation" (1817) বইয়ে বণ্টনের নীতি দিয়েছেন। এই তত্ত্বে তিনি জমিদার শ্রেণির প্রাধান্য খর্ব করে মূলধনের মালিকদের প্রাধান্য দিয়েছেন। জমিদারেরা জমির মালিকানার জোরে চাষির দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত খাজনার মাধ্যমে আত্মসাৎ করে এবং তা বিলাসব্যসনে নষ্ট করে। তাই রিকার্ডো করের মাধ্যমে এই উদ্বৃত্ত আহরণ করে বিনিয়োগের সুপারিশ করেছেন। রিকার্ডোর পর রাজনৈতিক অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচক হলেন কার্ল মার্ক্স (1818-1883)। তাঁর মতে, কোনো দেশ উন্নয়নের পাঁচটি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই পাঁচটি স্তর হল: (i) আদিম সাম্যাবস্থা, (ii) দাস প্রথা, (iii) সামন্ততন্ত্র (iv) ধনতন্ত্র ও (v) সমাজতন্ত্র। আদিম সাম্যাবস্থায় সবকিছুই সাধারণের সম্পত্তি। এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত শ্রম বা শোষণ বলে কিছু ছিল না। মূল উৎপাদনের ভিত্তি ছিল সহজ সমবায় (simple co-operation)। এরপর এল দাস ব্যবস্থা। এই স্তরে দাস ব্যবসায়ীরা দাসদের শোষণ

করত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাসদের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনের ফলে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্ততন্ত্র। এই ব্যবস্থায় জমিদার জমির মালিক। আর দাসেরা ভূমিদাসে (serfs) পরিণত হয়। জমিদারেরা চাষিদের তৈরি উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করত। (রিকার্ডোও তাই বলেছেন।) কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হওয়ার দরুন এবং পাশাপাশি শিল্প কলকারখানা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠার ফলে একসময় সামন্তবাদ ভেঙে পড়ে। উদ্ভব হল ধনতন্ত্রের। ভূমিদাসদের কারখানার প্রয়োজনেই স্বাধীন করে দেওয়া হল। ধনতন্ত্রে বা পুঁজিবাদে পুঁজিই প্রধান শক্তি। পুঁজিপতিরাই পুঁজির মালিক। সুতরাং তাদের শর্তেই শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের তৈরি উদ্বৃত্ত পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। এভাবেই শ্রমিক-মালিক সংঘাতের উদ্ভব ঘটে। অবশেষে শ্রমিক শোষণ তীব্র হলে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয় এবং শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করে। শ্রমিকরা এভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্র হল শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ। ঐখানে দুটি প্রধান শ্রেণি: পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণি বা সর্বহারা শ্রেণি। পুঁজিপতি চায় শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে অর্থাৎ শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা বাড়াতে। অন্যদিকে, শ্রমিক চায় বেশি মজুরি, কেননা তবেই তারা ভদ্রস্থ জীবনযাপন করতে পারবে। উভয় শ্রেণির স্বার্থের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। মার্ক্সের যুক্তি, ধনতন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে শ্রেণি-সংগ্রামের বীজ। বস্তুতপক্ষে, এক অর্থে দেখতে গেলে, ধনতন্ত্রের ইতিহাস হল বুর্জোয়া এবং সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস। মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল বক্তব্য হল, শ্রমিক শ্রেণিকে সংগ্রামের মাধ্যমে মালিক বা পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। মূলধনের মালিকানা আর কোনো শ্রেণির হাতে থাকবে না। ফলে সংঘাতমূলক উৎপাদন ব্যবস্থার (antagonistic mode of production) অবসান হবে। মূলধনের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবে। এভাবে উদ্ভব হবে সমাজতন্ত্রের।

সমাজতন্ত্রে মূলধনের সামাজিক মালিকানা। ফলে এটি আর শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নয়। এখানে পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন নির্ধারিত হয়। মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে তাই ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের শেষ লক্ষ্য হল সাম্যবাদ যেখানে মানুষের কোনো শোষণ থাকবে না, প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক শ্রেণি বা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of Proletariat)।

১.৩ সামন্ততন্ত্র

বিশিষ্ট দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্স (1818-1883) অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তর তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনো অর্থনীতি তার উন্নয়ন বা প্রসারের পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই পাঁচটি স্তর হল: (i) আদিম সাম্যবাদ, (ii) দাস ব্যবস্থা, (iii) সামন্ততন্ত্র, (iv) পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র এবং (v) সমাজতন্ত্র। সুতরাং, মার্ক্সের স্তর ক্রম তত্ত্বে সামন্ততন্ত্র হল তৃতীয় স্তর। এর পূর্বের স্তর হল দাস

ব্যবস্থা। এই দাস ব্যবস্থার নানা সংঘাতের ফলে এক সময় দাস ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তার স্থানে উদ্ভব হয় সামন্ততন্ত্রের।

কৃষিই হল সামন্ততন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক কাজকর্ম। এই ব্যবস্থায় জমর মালিক হল সামন্তপ্রভু বা জমিদার, রাজা, গির্জার যাজক প্রভৃতি। এই স্তরে দাসদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাদের ভূমিদাসে পরিণত করা হয়। ভূমিদাসেরা দাসদের মতো এতটা পরাধীন না হলেও তাদের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকতো। তারা ছিল অনেকটা মুচলেকবদ্ধ শ্রমিকের মতো (bonded labour)। তারা ইচ্ছামতো চাষের জমি ছেড়ে যেতে পারতো না। তারা বছরের কিছুদিন সামন্তপ্রভু বা জমিদারের জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকতো।

১.৩.১ সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামন্ততন্ত্রের **প্রথম ও প্রধান** বৈশিষ্ট্য হল যে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একেবারে উপরের স্তরে ছিল মহারাজা। তার নীচে ছিল সামন্তরাজা। সামন্তরাজার নীচে ছিল জমিদার। অনেকক্ষেত্রে জমিদারের নীচে ছিল জায়গিরদার, তালুকদার প্রভৃতি। ভূমিদাসেরা যে উদ্বৃত্ত ফসল ফলাতো তা নীচের থেকে উপরের দিকে যেতো খাজনার আকারে। ভূমিদাসেরা খাজনা দিত জায়গীরদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা ঐ খাজনার একটা অংশ দিত জমিদারকে। জমিদার আবার তার পাওয়া খাজনার একটা অংশ দিত সামন্তরাজাকে ইত্যাদি। এভাবে খাজনা একেবারে নীচের স্তরের ভূমিদাসের কাছ থেকে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে মহারাজার কাছে পৌঁছাতো।

সামন্ততন্ত্রের **দ্বিতীয়** বৈশিষ্ট্য হল, এই ব্যবস্থায় পূর্বের দাসব্যবস্থার দাসেরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। এরা দাসব্যবস্থার দাসেদের মতো পুরোপুরি পরাধীন ছিল না। তারা ভূমির অধিকারীদের অর্থাৎ সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। এদের কিছু জমি দেওয়া হল নিজেদের চাষ আবাদের জন্য। তার বিনিময়ে তারা সামন্তপ্রভুদের জমি চাষ করতে বাধ্য থাকতো। অনেক সময় তাদের বসবাসের জায়গাও দেওয়া হতো। তারা ইচ্ছা করলেই জমিদারের জোত ত্যাগ করে যেতে পারতো না। বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিন তারা জমির মালিকের জমিতে চাষ করতে বাধ্য থাকতো।

সামন্ততন্ত্রের **তৃতীয়** বৈশিষ্ট্য হল, এই স্তরে চাষ আবাদের উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটে। অনেক পতিত জমি উদ্ধার করে চাষের আওতায় আনা হয়।

চতুর্থত, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমিদাসেরা নিজেরা কিছু জমি পায় এবং তাই তারা উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়। ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এছাড়া এই যুগে জলশক্তি ও বায়ুশক্তিকে কাজে লাগানো শুরু হয়। বায়ুশক্তির দ্বারা পালতোলা জাহাজ ও বড় নৌকার পরিবহন এবং জলশক্তির সাহায্যে গম পেষাই প্রভৃতি শুরু হয়।

পঞ্চমত, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। ফলে হস্তশিল্পেরও দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। কাগজ, ছাপাখানা, বারুদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উদ্ভাবন হয়।

ষষ্ঠত, সামন্ততান্ত্রিক স্তরে কৃষিবিজ্ঞানেরও দ্রুত উন্নতি দেখা দেয়। নতুন নতুন ধরনের দানাশস্য, ফলমূল ও শাক-সবজির চাষ-আবাদ শুরু হয়। পশুপালনও বিস্তার লাভ করে।

১.৩.২ সামন্ততন্ত্রের গুণ :

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়েকটি সুফল আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি।

১. দাসব্যবস্থার তুলনায় এই স্তরে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেশি ছিল। বেশি উৎপাদন করতে পারলে ভূমিদাসেরাও বাড়তি উৎপাদনের একটা অংশ পেত। ফলে তারা কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট ছিল।

২. এই স্তরে কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসার ঘটে। পাশাপাশি যন্ত্রের মাধ্যমেও নানা দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হয়।

৩. যখন সামন্ততন্ত্র ভেঙে যায় এবং তার জায়গায় পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে, তখন এই জমিদার বা সামন্তপ্রভুরাই উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং সামন্ততন্ত্রই দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ও প্রসারে উদ্যোগ শক্তির জোগান দেয়।

৪. যখন সামন্ততন্ত্রের শেষভাগে বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠছে, তখন এই সামন্তপ্রভুরাই প্রাথমিক মূলধনের জোগান দিয়েছে। ভূমিদাসদের দ্বারা উৎপন্ন যে উদ্বৃত্ত এই জমিদার শ্রেণি আত্মসাৎ করে বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছিল, তাই-ই পুঁজিবাদের বিকাশে প্রাথমিক মূলধন হিসাবে কাজ করেছে।

৫. সামন্তপ্রভুদের দরবারে ও রাজারাজড়াদের রাজদরবারে এবং অন্দরমহলের জন্য নানা বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন হত। সূক্ষ্ম কারুকার্য করা নানা অলংকার এবং শৌখিন দ্রব্য, হাতির দাঁতের কাজ, সূক্ষ্ম ও মসৃণ তাঁত বস্ত্র ইত্যাদির চাহিদা আসত এই সমস্ত জমিদার ও রাজপরিবার থেকে। এদের জন্যই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিযুক্ত নানা ধরনের কারিগর তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হত।

৬. জমিদার, জায়গিরদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের ভোগপ্রবণতা ছিল খুব বেশি। তারা নানা আচার অনুষ্ঠানে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাপনেও প্রচুর ব্যয় করতো। এদের এই ভোগপ্রবণতা দেশে কার্যকরী চাহিদার সৃষ্টি করতো, দেশটি মন্দা বা অতি উৎপাদনের সমস্যায় পড়তো না। ম্যালথাস প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন যে, সামন্তপ্রভুদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা

দেশের নিয়োগ বৃদ্ধিতে এবং বেকারত্ব দূর করতে সাহায্য করেছে।

৭. সামন্ততন্ত্রে তিন ধরনের খাজনা দেখা গেছে— শ্রম খাজনা অর্থাৎ শ্রম দিয়ে ভূমিদাসদের খাজনা মেটানো, দ্রব্যে প্রদত্ত খাজনা অর্থাৎ ফসলের একটা অংশ প্রদান এবং অর্থে প্রদত্ত খাজনা।

১.৩.৩ সামন্ততন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি :

সামন্ত্রতন্ত্রের প্রধান দোষ বা ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ:

১. সামন্ত্রতন্ত্রে ভূমিদাসরা উদ্বৃত্ত ফসলের একটা অংশ জমিদার বা জায়গীরকে দিত। সেখান থেকে রাজার হাত ঘুরে অবশেষে তা মহারাজার কাছে পৌঁছাতো। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত কৃষক এবং মহারাজের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তাদের মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি ছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্রমাগত চাপ দিয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। এটিই ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা এবং শোষণমূলক দিক।

২. এই ব্যবস্থায় প্রকৃত কৃষক এবং জমির মালিকের মাঝে যে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী ছিল তারা একেবারেই অনুৎপাদনশীল শ্রেণি। উৎপাদনের কাজে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

৩. মধ্যস্বত্বভোগীরা শুধু খাজনা আত্মসাৎ করত। তারা কৃষির উন্নতির জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

৪. অনেক জমিদার খাজনা আদায় করে শহর বা গঞ্জে বাস করত। এদের অনুপস্থিত জমিদার (absentee landlord) বলা হয়। প্রকৃত চাষি বিপদ-আপদের সময় অথবা চাষের কোনো প্রয়োজনে এদের সাহায্য পেত না।

৫. রিকার্ডোর মতে, সামন্তপ্রভুরা কৃষি হতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত খাজনা বিলাসবহুল জীবনযাপনে ব্যয় করত। সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োজিত না হয়ে দুর্গ, সমাধি, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছে।

ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ক্রমশ নানা পরিবর্তন দেখা দেয়, যেমন, শ্রমবিভাগের প্রচলন ও প্রসার, গ্রাম ও শহরের মধ্যে জীবনযাত্রার পার্থক্য, বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহার, কারখানার উদ্ভব প্রভৃতি। এগুলির প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে অধিকমাত্রায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে হয়। তার ফলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের পরিবর্তে কারখানা প্রথার উদ্ভব ঘটে। কারখানায় উৎপাদনের জন্য স্বাধীন শ্রমিক প্রয়োজন হয়। কারখানা প্রথার

চাপেই ভূমিদাসদের স্বাধীন করে দেওয়া হয়। এভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে গিয়ে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে।

১.৪ ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ

১.৪.১ ধনতন্ত্রের উৎপত্তি

কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যে সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রথাভিত্তিক নিয়মকানুনের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সমস্ত নিয়মকানুনের সমষ্টিকে একত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হল। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান পৃথিবীতে মূলত দু'রকমের— (i) ধনতন্ত্র বা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বর্তমান বিভাগে আমরা ধনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করব এবং পরবর্তী বিভাগে (বিভাগ ১.৫) আমরা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করব। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র ছাড়াও তৃতীয় একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথাও অনেকে বলে থাকেন। সেটি হল মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু এটি কোনো মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়। এটি আসলে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিশ্র রূপ। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, আবার সমাজতন্ত্রেরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কারখানাভিত্তিক উৎপাদন। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন। কুটিরের বা গৃহের আঙিনায় অবস্থিত হস্তশিল্পের পরিবর্তে দেখা দেয় বৃহৎ কারখানা। সেখানে বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ফলে এই ব্যবস্থা প্রথম গড়ে ওঠে। শীঘ্রই তা পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপানই হল অন্যতম উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ।

১.৪.২ ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

যে আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, ভোগকারী এবং বিনিয়োগকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে এবং অর্থনীতিতে দামব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করে সেই আর্থিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সংক্ষেপে ধনতন্ত্র বলে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কার্ল মার্ক্স তাঁর স্তর ক্রমের তত্ত্বে বলেছেন যে, কোনো একটি দেশ তার উন্নয়নের সময় পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই পাঁচটি স্তর হল: আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সুতরাং, মার্ক্সের স্তরক্রমের বর্ণনা অনুযায়ী ধনতন্ত্র হল কোনো অর্থনীতির উন্নয়নের চতুর্থ স্তর। প্রতিটি স্তরেরই নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ধনতন্ত্র বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

আমরা ধনতন্ত্রের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিগত মালিকানা (Private ownership) : ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। শ্রম ও মূলধন এই দুটি প্রধান উপকরণ ধরলে ধনতন্ত্রে উপকরণের মালিকানার ভিত্তিতে দুটি শ্রেণি থাকে। এখানে কোনো ব্যক্তি মূলধনের মালিক; আবার কোনো ব্যক্তি শ্রমের মালিক। মূলধনের মালিকদের পুঁজিপতি বলা হয়; আর শ্রমের মালিককে শ্রমিক বলা হয়। উপকরণের মালিক তার ইচ্ছামতো উপকরণ বিক্রি করে আয় করতে পারে। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের ভিত্তিতে তাহলে দুটি শ্রেণি থাকে: পুঁজিপতি এবং শ্রমিক। পুঁজিপতি শ্রমিককে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। এ ব্যাপারে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে।

২. ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব (Consumer's sovereignty) : ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভোগকারী বা ক্রেতার দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। ক্রেতারা তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারে।

৩. উদ্যোগের স্বাধীনতা (Freedom of enterprise) : ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। উদ্যোক্তা তার বিনিয়োগ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হবে, কতটা উৎপাদন করা হবে, কোন্ পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে উদ্যোক্তা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোক্তার কাজকর্মে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে না। উদ্যোগের স্বাধীনতার মধ্যে শ্রমিকের স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে যে-কোনো পেশা গ্রহণ করার অধিকার। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকার ফলে শ্রম ও মূলধনের অবাধ গতিশীলতা বজায় থাকে।

৪. দাম ব্যবস্থা (Price system বা Price mechanism) : ধনতন্ত্রে দাম ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করে। এই অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও জোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা কোনো কিছুর দাম নির্ধারিত হয়। এই বাজারি শক্তিকে সরকার কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। বাজারে চাহিদা ও জোগানের শক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। দাম ব্যবস্থা বা বাজারি শক্তির মাধ্যমেই সম্পদের বণ্টন হয়ে থাকে। এই দাম ব্যবস্থাকে বাজার ব্যবস্থাও (market mechanism) বলা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপকরণ উভয়েরই দাম বাজার ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উপকরণ বা উপাদানের দাম আবার তার মালিকের আয় নির্ধারণ করে। সুতরাং দামব্যবস্থা দেশের আয় বণ্টনও নির্ধারণ করে। এই দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থাকে অ্যাডাম স্মিথ "অদৃশ্য হস্ত" (invisible hand) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এই অদৃশ্য হস্তের (অর্থাৎ দাম ব্যবস্থার) সংকেতের মাধ্যমেই সমস্ত অর্থনীতির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.৪.৩ ধনতন্ত্রের গুণ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্রের কতকগুলি গুণ বা সুবিধা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

১. ব্যক্তির স্বাধীনতা : ধনতন্ত্রে ভোগকারী ও বিনিয়োগকারী উভয়েই স্বাধীনতা ভোগ করে। ভোগকারী তার নিজস্ব রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারে। ফলে তার তৃপ্তি সর্বাধিক হয়। তেমনি, বিনিয়োগকারী তার উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তাছাড়া, এখানে সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয়। এককথায়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে (individualism) গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় থাকে।

২. দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা : ধনতন্ত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেকে দক্ষতম বলে মনে করেন। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যেকে তার দক্ষতা অনুযায়ী পুরস্কার পায়। ফলে লোকেরা আরো কাজ করার অনুপ্রেরণা পায়। কাজে শিথিলতা দেখানো বা দায় এড়ানোর প্রবণতা থাকে না।

৩. উপকরণের দক্ষ বণ্টন : ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে সচল। ফলে কোনো একটি উপকরণ সেই কাজে নিযুক্ত হয়, যে কাজে উপকরণটি সবচেয়ে দক্ষ। ফলে উপকরণগুলি থেকে সর্বাধিক প্রতিদান পাওয়া সম্ভব হয়।

৪. সর্বনিম্ন ব্যয় : ধনতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রতিযোগিতার উপস্থিতি। এখানে দ্রব্য বা উপাদানের দাম, পরিমাণ প্রভৃতি চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তা ছাড়া, প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ উৎপাদক বাজার থেকে অপসৃত হয়। শুধুমাত্র দক্ষতম উৎপাদকেরাই দীর্ঘকালে বাজারে টিকে থাকে। প্রতিযোগিতার ফলে দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন সর্বনিম্ন হয়। ক্রেতারাও সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি পেয়ে থাকে।

৫. উদ্ভাবনের সুযোগ : ধনতন্ত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদকদের অনবরত উৎপাদন ব্যয় কমানোর চেষ্টা করতে হয়। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন উপাদান, নতুন বাজার প্রভৃতির অনুসন্ধান করতে হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে। তা ছাড়া, কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটাতে পারলেও উৎপাদন ব্যয় কমে। সেজন্য উৎপাদকেরা অনবরত উৎপাদন কৌশলের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়। এভাবে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটে। দেশটির সামগ্রিক উন্নয়ন হার বৃদ্ধি পায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুম্পিটার (Schumpeter) তাই 'গতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন।

৬. আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি : ধনতন্ত্রে জনগণের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অবাধ অর্থনীতি (laissez faire economy)। ফলে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ থেকে দেশটি মুক্ত থাকে। সরকারি অদক্ষতা ও দীর্ঘসূত্রতা থাকে না, আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য ও দুর্নীতি থেকেও দেশটি মুক্ত থাকে। ধনতন্ত্র তাই বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এক দক্ষ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা।

১.৪.৪ ধনতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি

তত্ত্বগতভাবে ধনতন্ত্র দক্ষতম উৎপাদন ব্যবস্থা হলেও এর নানা দোষ বা ত্রুটিও আছে। সংক্ষেপে ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ:

১. আয় বৈষম্য : ধনতন্ত্রে লোকে দক্ষতা অনুযায়ী উপার্জন করে। যার দক্ষতা বেশি, সে বেশি উপার্জন করে। আর যার দক্ষতা কম, সে কম উপার্জন করে। ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য দেখা দেয়। দেশের সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

২. বাণিজ্যচক্রের উপস্থিতি : ধনতন্ত্রে অপরিকল্পিতভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের উৎপাদন ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে কখনও কম উৎপাদন, কখনও বেশি উৎপাদন ঘটে থাকে। সেজন্য ধনতন্ত্রে আয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা নিয়মিতভাবে ঘটতে থাকে।

৩। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা: ধনতন্ত্রে প্রতিযোগিতা বাস্তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। ছোটো উৎপাদকেরা প্রতিযোগিতার ফলে বাজার থেকে অপসৃত হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় পুঁজিপতি বাজারে টিকে থাকে। অর্থনীতিতে এধরনের বাজারকে অলিগোপলি বাজার বলে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সুফল পাওয়া যায় না। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার অপচয়মূলক (wasteful)। তা ছাড়া, এই ধরনের বাজারে ক্রেতাকে বেশি দাম দিতে হয়, বিক্রেতারা অস্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে, সম্পদের অপচয় হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হয় না।

৪. ক্রেতাদের স্বাধীনতা হানি : বাস্তবে ধনতন্ত্রে ক্রেতাদের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব থাকে না। এখানে বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং প্রচার কৌশলের দ্বারা ক্রেতাদের পছন্দকে প্রভাবিত করা হয়। তা ছাড়া, নিম্ন আয়ের ক্রেতারা অনেক সময় তাদের পছন্দমতো দ্রব্য কিনতে পারে না। সুতরাং, বাস্তবে ক্রেতাদের পছন্দের স্বাধীনতা থাকে না।

৫. শ্রমিকের শোষণ : ধনতন্ত্রে প্রধান দুটি শ্রেণি হল পুঁজিপতি ও শ্রমিক। এদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। পুঁজিপতি চায় কম মজুরি দিয়ে শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা বাড়াতে। অন্যদিকে, শ্রমিক চায় বেশি মজুরি, কিন্তু শ্রমিকের কাছে পুঁজি নেই বলে তাকে পুঁজিপতির শর্তে কাজ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে।

৬. অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন : ধনতন্ত্রে মুনাফার দিকে তাকিয়ে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে যে দ্রব্যে মুনাফা বেশি, সেটি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই দ্রব্যটি সমাজের কল্যাণের দিক থেকে কাম্য নাও হতে পারে। ধনতন্ত্রে এজন্য অনেক অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন হয়ে থাকে।

৭. দাম ব্যবস্থার বিকৃতি : বাস্তবে ধনতন্ত্রে দামব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না। বাস্তবে পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে দাম নিয়ন্ত্রণ করে। এতে ক্রেতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং কাম্য স্তরে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

৮. মুনাফাবাজি : ধনতন্ত্রে উৎপাদকদের কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না। ফলে পুঁজিপতিরা অনেক সময় বাজারে কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি করে চড়া দামে দ্রব্য বিক্রি করে এবং অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। বন্যা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটা বেশি হয়ে থাকে।

৯. সাম্রাজ্যবাদের প্রসার : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা বেশি মুনাফার লোভে বিদেশের বাজার দখলের চেষ্টা করে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের প্রসার ঘটে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি বিদেশের বাজার দখল করে।

ধনতন্ত্রের বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করতে কিছু সংশোধনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে অর্থাৎ ধনতন্ত্রের অবাধ অর্থনীতি (laissez faire) বর্তমানে নেই। নানা সরকারি বিধিনিষেধ এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর আরোপ করা হচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্রের স্থানে এসেছে নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র (regulated capitalism)। এতে অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি কিছুটা দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

১.৪.৫ ধনতন্ত্রের প্রসার সম্পর্কে স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্ক্সের অভিমত :

❖ **স্মিথের তত্ত্ব** (Theory of Smith) : অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations বা সংক্ষেপে Wealth of Nations বইয়ে বলেছেন যে, তাঁর আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদেরা, বিশেষত স্মিথ ও রিকার্ডো, ধনতন্ত্রের বিকাশের তাত্ত্বিক রূপরেখা দিয়েছেন। স্মিথের মতে, কোনো জাতির সম্পদ বলতে সোনা ও রূপোকে বোঝায় না, সম্পদ নির্ভর করে উৎপাদনের পরিমাণের উপর। তাই কোনো দেশের সম্পদ বাড়াতে গেলে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি অবশ্য প্রকৃতিবাদীদের (physiocrats) ন্যায় কৃষির উপর জোর দেননি। বরং বাণিজ্যবাদীদের ন্যায় শিল্প ও বাণিজ্যের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, কৃষিতে বিশেষায়ণের সুযোগ নেই; কিন্তু শিল্পে বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগের সুযোগ আছে। ফলে কৃষির চেয়ে শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হবে।

স্মিথ ধনতন্ত্রকে একটি অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (laissez faire economy) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কল্যাণ সর্বাধিক করতে চাইলে সমাজের কল্যাণও সর্বাধিক হবে। তাই তিনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে, অবাধ অর্থনীতিতেই সমাজের কল্যাণ সর্বাধিক হবে।

তাই অবাধ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতিই তাঁর কাছে সর্বোত্তম। মনে হতে পারে, এই ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। কিন্তু স্মিথ বলেছেন যে, অবাধ অর্থনীতিতে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটি হল দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থা। এই দামব্যবস্থাকে তিনি "অদৃশ্য হাত" (invisible hand) বলে অভিহিত করেছেন। এটিই তাঁর তত্ত্বে কোনো জাতির বা দেশের সম্পদ তৈরির পিছনে কেন্দ্রীয় ধারণা।

স্মিথের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই মূলধন চয়ন কেননা মূলধন চয়ন (capital accumuation) ছাড়া শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ সম্ভব নয়। মূলধন চয়নের জন্য সঞ্চয় বাড়াতে হবে। স্মিথ তাই উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় বা মিতব্যয়িতার উপর জোর দিয়েছেন। লোকের সঞ্চয় বাড়লে তা মূলধনের সঙ্গে যোগ হয়, দেশটির মূলধনের জোগান বাড়ে। ইহা বৃহদায়তন উৎপাদন এবং আরো বেশি শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণে সাহায্য করে। ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্বে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই শ্রমবিভাগ বাজারের আয়তনের দ্বারা সীমায়িত হতে পারে (Division of labour may be limited by the extent of market)। সুতরাং, শ্রমবিভাগ প্রসারিত করতে হলে বাজার প্রসারিত করতে হবে। স্মিথের মতে, বাজার প্রসারিত করতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রবর্তন করতে হবে। এই বৈদেশিক বাণিজ্য আসলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সুযোগ এনে দেয়। যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং তারপর একে অপরের সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় করবে। এর ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির মোট উৎপাদন বাড়বে। এভাবে অবাধ অর্থনীতিটি সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছায়। স্মিথের ভাষায় অর্থনীতিটি একটি নিশ্চল অবস্থায় (stationary state) পৌঁছায়। সুতরাং স্মিথের তত্ত্বে নিশ্চল অবস্থাটি কোনো হতাশার অবস্থা নয়। এই অবস্থায় দেশটি তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্ভাব্য সর্বাধিক প্রাচুর্যের স্তরে পৌঁছায়। স্মিথের ভাষায়, এই অবস্থায় দেশটি "reaches its full complement of riches".

স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্বে প্রধান চালিকাশক্তি হল মূলধন গঠন। স্মিথের মতে, মূলধনের গঠনের হার আবার নির্ভর করে দেশটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর। সুতরাং স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্বে প্রতিষ্ঠানের (institutions) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো সম্পর্কে স্মিথের কথা বলতে গেলে আমাদের বলতে হয় যে, স্মিথ ছিলেন অবাধ অর্থনীতি এবং অবাধ বাণিজ্যের দৃঢ় সমর্থক। তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (individualism) পূজারী। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ঐ ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল প্রকৃতিবাদীদের (physiocrats) মতো। তাঁর মতে, অবাধ অর্থনীতিতে বাজার বেশি প্রসারিত হয় এবং আরো শ্রমবিভাগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই ধনতন্ত্রে বা অবাধ উদ্যোগ অর্থনীতিতে জনগণের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র বা

সরকারের বিশেষ কিছু করণীয় নেই। অদৃশ্য হস্ত বা দাম ব্যবস্থা একদিকে ক্রেতাদের সর্বাধিক তৃপ্তি ঘটায় এবং অন্যদিকে উৎপাদনেও সম্পদের কাম্য বণ্টন ঘটায়। ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য (harmony) ঘটে। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী নয়, সরকার শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করবে। অন্য সব ক্ষেত্রেই সরকারের নীতি হওয়া উচিত অবাধ অর্থনীতি বা স্বাচ্ছন্দ্যনীতি (laissez faire policy)। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে এটাই অ্যাডাম স্মিথের মত। তাঁর অদৃশ্য হাতের ধারণা সেই অভিমতই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করছে।

❖ **রিকার্ডোর তত্ত্ব (Theory of David Ricardo) :** প্রাচীন ধনবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো তাঁর Principles of Political Economy and Taxation (1817) বইয়ে ধনতন্ত্রের প্রসার সম্পর্কে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম, জনসংখ্যার চাপ এবং জমিদার শ্রেণির অনুৎপাদক ভোগ একটি অর্থনীতিকে নিশ্চল অবস্থায় (stationary state) নিয়ে যায়। রিকার্ডোর মডেলে নিশ্চল অবস্থার ধারণা স্মিথের মডেলের অনুরূপ নয়। স্মিথের তত্ত্বে নিশ্চল অবস্থা হল এমন এক অবস্থা যেখানে এক অবাধ অর্থনীতি উন্নয়নের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায় (reaches its full complement of riches)। কিন্তু রিকার্ডোর তত্ত্বে নিশ্চল অবস্থা হল এমন এক অবস্থা যেখানে মুনাফার হার, মূলধন গঠনের হার, উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রভৃতি শূন্য। তিনি একটি সহজ মডেলের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মডেলটি নিম্নলিখিত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

i) দেশে একটি মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে। দ্রব্যটি হল শস্য (corn)।

ii) জমির জোগান নির্দিষ্ট।

iii) উৎপাদনের উপকরণ তিনটি— জমি, শ্রম ও মূলধন। শ্রম ও মূলধন সর্বদাই ১:১ অনুপাতে নিযুক্ত হচ্ছে। সুতরাং এই মডেলে জমি হল স্থির উপাদান এবং মূলধনসহ শ্রম হল পরিবর্তনীয় উপাদান।

iv) নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে বেশি বেশি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করবে।

v) মজুরির হার জীবনধারণের স্তরে (subsistence level) নির্দিষ্ট।

vi) বণ্টনের ক্ষেত্রে দু'ধরনের নীতি রয়েছে। একটি হল প্রান্তিক নীতি এবং অপরটি হল উদ্বৃত্ত নীতি। প্রান্তিক নীতিটি হল, পরিবর্তনীয় উপাদান তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী প্রতিদান পায়। উদ্বৃত্ত নীতিটি হল, পরিবর্তনীয় উপাদানের পাওনা মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা স্থির উপাদানের মালিক অর্থাৎ জমিদার পায়।

vii) কোনো স্থির মূলধন (fixed capital) নেই। সবটাই শস্যের আকারে পরিবর্তনীয় মূলধন (circulating capital)।

viii) মুনাফা হল মূলধন গঠনের উৎস।

এই অনুমানগুলির উপর ভিত্তি করে রিকার্ডো দেখিয়েছেন কীভাবে একটি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছায়। তাঁর মতে, জনসংখ্যা বাড়লে কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ বাড়ে। ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করতে শুরু করে। জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। তাই চাষিদের মধ্যে জমি পাবার জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ে। এর ফলে খাজনা বাড়ে। জমিদার শ্রেণির লাভ হয়। মোট উৎপাদনে খাজনার অংশ বাড়ে এবং মুনাফার অংশ কমতে থাকে। মুনাফাই মূলধন গঠনের উৎস। মুনাফাই পুনরায় উৎপাদনে বিনিয়োজিত হয়। কিন্তু মুনাফার অংশ কমার ফলে বিনিয়োগ কমতে থাকে। অন্যদিকে, খাজনার অংশ বাড়লেও তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে না। জমিদারেরা অর্থাৎ জমির মালিকেরা তাদের খাজনা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করে। খাজনা থেকে কোনো মূলধন গঠন হয় না। সেজন্য খাজনার পরিমাণ বাড়তে থাকলেও দেশটি ক্রমাগত নিশ্চল অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে। রিকার্ডোর মডেলের তাৎপর্য হল যে, খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের উদ্বৃত্ত। সরকারের উচিত এই উদ্বৃত্ত করের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা মূলধনের মালিকদের অর্থাৎ পুঁজিপতিদের হাতে দিতে হবে। তবেই দেশটি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। ইংলণ্ডের জমিদার শ্রেণির জীবনধারণ প্রণালীকে রিকার্ডো ভালো চোখে দেখেননি। এদের অনুৎপাদনশীল ভোগকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মডেলে তিনি তাই জমিদার শ্রেণির ভূমিকার সমালোচনা করেছেন এবং তাদের স্বার্থ খর্ব করার জন্য জমিদারের উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার উপর কর বসাতে সুপারিশ করেছেন। সেই কর-রাজস্ব এখন উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, রিকার্ডোর তত্ত্বে কৃৎকৌশলের উন্নতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া, তাঁর তত্ত্বে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, সরকারি হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রভৃতি অনুমান করা হয়েছে। এগুলি বাস্তবসম্মত নয়। তবুও এই তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের জন্য শুধু উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় থাকলেই হবে না, তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে— এই মডেলে তা সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। উন্নয়নের জন্য যে উপযুক্ত সামাজিক কাঠামো প্রয়োজন, তাও এই মডেলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেই মডেলটির গুরুত্ব বা সার্থকতা।

মার্ক্সের তত্ত্ব (Theory of Marx) : মার্ক্সের তত্ত্ব আসলে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও পরিণাম সম্পর্কে বিশ্লেষণ। মার্ক্সের মতে ধনতন্ত্র হল সমাজের এমন এক সংগঠন যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্রব্য ও সেবাকার্যের উৎপাদন সংগঠিত করা হয়। ধনতন্ত্রে দুটি শ্রেণি: পুঁজিপতি এবং শ্রমিক। পুঁজিপতি পুঁজি বা মূলধনের (মার্ক্স যাকে বলেছেন, উৎপাদনের মাধ্যম) মালিক। শ্রমিকদের মূলধন বা উৎপাদনের মাধ্যম নেই। তারা পুঁজিপতিকে শ্রম বিক্রি করে মজুরি পায়।

মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো সমাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে। সেগুলি হল: আদিম সাম্যবাদ, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। সুতরাং ধনতন্ত্র মার্ক্সের স্তরক্রমের চতুর্থ স্তর। মার্ক্সের মতে, একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে উত্তরণ ঘটে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হল, উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই কোনো অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে। এখন, উৎপাদনের শক্তি, উৎপাদনের সম্পর্কের চেয়ে বেশি গতিশীল। উৎপাদনের শক্তি যত দ্রুত বিকাশ লাভ করে, উৎপাদনের সম্পর্ক তত দ্রুত বিকাশ লাভ করে না। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ বা সংঘাত তৈরি হয়। পুরনো উৎপাদনের সম্পর্ক নতুন বিকশিত উৎপাদনের শক্তিকে স্থান দিতে (accommodate) পারে না। এই অবস্থায় পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেশটির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (dialectical materialism)। এখন, মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে ধনতন্ত্র হল চতুর্থ স্তর। এই চতুর্থ স্তরেও উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ বা সংঘাত দেখা দেবে। ফলে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন, ধনতন্ত্রে এই বিরোধ বা সংঘাতটি কোথায় বা কীরূপ, তা দেখা যাক।

আমরা বলেছি, ধনতন্ত্রে মূলধন বা উৎপাদনের মাধ্যমের মালিকানা পুঁজিবাদীর। শ্রমিকের কোনো মূলধন নেই, তার আছে শ্রম। সুতরাং, জীবনধারণের জন্য তাকে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করতে হয়। এই মজুরির হার একতরফাভাবে পুঁজিপতি ঠিক করে। শ্রমিকেরা এখানে মজুরি দাস (wage slave)। পুঁজিপতির দ্বারা নির্ধারিত মজুরিতে শ্রমিককে কাজ করতে হয়। মার্ক্সের মতে, শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক যতটা মূল্য তৈরি করে, তার চেয়ে সে কম মজুরি পায়। এই দুয়ের পার্থক্য হল উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিক এই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু পুঁজিপতি পুঁজির মালিকানার জোরে এই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে। সুতরাং, ধনতন্ত্রে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র থাকে না। এখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এক শ্রেণি অপর শ্রেণিকে শোষণ করে। এভাবে ধনতন্ত্রে উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের পিছনে মূল কারণ হল মূলধন বা পুঁজির শ্রেণি মালিকানা (class ownership of means of production)। মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের এই বিরোধ দূর হবে যদি মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা দূর করে সামাজিক মালিকানা (social ownership of capital) প্রতিষ্ঠা করা হয়। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে, এটি ঘটবে যখন শ্রমিকরা শ্রেণি সংগ্রামের দ্বারা পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে। তখন মূলধনের আর ব্যক্তিগত বা শ্রেণি মালিকানা থাকবে না। তার বদলে মূলধনের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে মার্ক্স বলেছেন সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রে মূলধনের শ্রেণি মালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ ধনতন্ত্রে দেখা যেত, তা অন্তর্হিত হবে।

ধনতন্ত্র যে একসময় তার অন্তর্নিহিত বিরোধের জন্য ভেঙে যাবে, তা মার্ক্স আর একভাবেও দেখিয়েছেন। মার্ক্স বলেছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট অবশ্যম্ভাবী। আমরা বলেছি যে, ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং তা পুনরায় বিনিয়োগ করে। একে বলা হয় মূলধন চয়ন (capital accumulation)। মার্ক্স দেখিয়েছেন যে, যতই মূলধন চয়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকে, মুনাফার হার কমার ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে ধনতন্ত্রে সংকট ঘনীভূত হয়। আর এক ভাবেও ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দিতে পারে। ধনতন্ত্রে শ্রমিক শোষণের ফলে শ্রমিকরা ক্রমাগত দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে। ফলে বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার অভাব তৈরি হয়। পুঁজিপতিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রি করতে পারে না। এভাবেও ধনতন্ত্রে সংকট তৈরি হয়। আবার, ধনতন্ত্রে অসংখ্য পুঁজিপতি তাদের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ও হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে কোথাও বেশি বিনিয়োগ, কোথাও কম বিনিয়োগ হয়ে থাকে। কোথাও বেশি উৎপাদন, আবার কোথাও কম উৎপাদন হয়ে থাকে। এর ফলেও ধনতন্ত্রে সংকট তৈরি হয়। এই ধরনের সংকটের পিছনে কারণ হল ধনতন্ত্রে পরিকল্পনাহীনতা বা পরিকল্পনার অভাব (planlessness in a capitalist system)। এই সংকট এড়াতে যদি পুঁজিপতিরা মজুরি কমায়, তাহলে মুনাফার হার বাড়বে, কিন্তু মজুরি কমার ফলে শ্রমিক শ্রেণির ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমবে। বাজারে সব দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হবে না। অর্থাৎ ভোগ ঘাটতির সংকট দেখা দেবে। আবার, ভোগ ঘাটতি এড়াতে যদি শ্রমিকদের বেশি মজুরি দেওয়া হয়, তাহলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ার দরুন মুনাফার হার কমবে এবং সংকট দেখা দেবে। তাহলে মার্ক্সের তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো না কোনো ভাবে ধনতন্ত্রে সংকট আসবে এবং একদিন ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হবে ও সমাজতন্ত্র আসবে। বাস্তবে অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, ধনতন্ত্র এখনও টিকে আছে; বরং সমাজতন্ত্রই বিলুপ্ত হচ্ছে এবং তার ধনতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন ঘটছে। সেটি অবশ্য অন্য বিতর্ক বা অন্য আলোচ্য বিষয়।

১.৫ সমাজতন্ত্র

যে ব্যবস্থায় দেশের সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা থাকে, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন ও দাম কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তাকে সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Socialist Economic System) বলে। ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি দূর করে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের ধারণার উদ্ভব।

১.৫.১ সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। সংক্ষেপে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

i) **সম্পদের সামাজিক মালিকানা (Social ownership of resources) :** সমাজতন্ত্রে সমস্ত রকম সম্পদের সামাজিক মালিকানা থাকে। ধনতন্ত্রের ন্যায় এখানে ব্যক্তি মালিকানা থাকে না। সামাজিক মালিকানা প্রধানত দু'রকমের। একটি হল সরকারি মালিকানা এবং অপরটি হল সমবায়িক মালিকানা। উভয় ক্ষেত্রেই সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না। ধনতন্ত্রে মূলধনের মালিক পুঁজিপতি শ্রেণি। কিন্তু সমাজতন্ত্রে মূলধনের সামাজিক মালিকানা।

ii) পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা (Planned economy) : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে। এই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই স্থির করে কোন্ কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, কোন্ দ্রব্য কীভাবে উৎপাদন করা হবে, কোন্ দ্রব্যের দাম কত হবে ইত্যাদি। স্যামুয়েলসন বলেছিলেন যে, কোনো অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা হল তিনটি: কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী কতটা পরিমাণে উৎপাদন করা হবে? কীভাবে উৎপাদন করা হবে? কাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে? সমাজতন্ত্রে এই তিনটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ। বস্তুত, পরিকল্পনা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। সমাজতন্ত্র এবং পরিকল্পনা যেন সমার্থক— একটি অপরকে নির্দেশ করে।

iii) আরোপিত দাম ব্যবস্থা (Imposed price system) : ধনতন্ত্রে বাজারি শক্তির দ্বারা অর্থাৎ চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে সেই অর্থে কোনো বাজার ব্যবস্থা নেই। সুতরাং, এখানে চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা অর্থাৎ বাজারি শক্তির দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না। এখানে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই সমাজের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কোনো দ্রব্যের বা উপকরণের দাম নির্ধারিত করে। সুতরাং সমাজতন্ত্রে দাম পদ্ধতি হল আরোপিত দাম পদ্ধতি।

iv) নিয়োগের অধিকার (Right to employment) : সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কাজের অধিকার স্বীকার করা হয়। এখানে সরকার প্রত্যেক নাগরিককে কাজ দিতে বাধ্য থাকে। ফলে সমাজতন্ত্রে বেকার সমস্যা নেই। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রমের বিনিময়ে আয় উপার্জন করতে হয়।

১.৫.২ সমাজতন্ত্রের গুণ (Merits of Sociolism)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের কিছু সুবিধা আছে।

সমাজতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

i) **সমাজকল্যাণের লক্ষ্য (Motive of social welfare) :** সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলির মালিক হল সরকার। এক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য হল দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা। ধনতন্ত্রে মুনাফা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে উৎপাদন সংগঠিত করা হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে মুনাফা অর্জনই প্রধান

বিবেচ্য নয়। এখানে সমাজকল্যাণই মূল লক্ষ্য। সেজন্য লোকসান হলেও কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন চালু রাখা হয় বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে।

ii) পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned economy) : সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনার দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। ফলে এখানে সম্পদের কাম্য বণ্টন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও দ্রুত হয়।

iii) সামাজিক ন্যায় (Social justice) : সমাজতন্ত্রে আয় ও সম্পদ বণ্টনে ধনতন্ত্রের ন্যায় বৈষম্য থাকে না। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বলে আয় বৈষম্যর সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে উপকরণের সামাজিক মালিকানা বর্তমান অর্থাৎ সরকারই উপকরণগুলির মালিক। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না বলে আয় বৈষম্য থাকে না।

iv) শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ (Classless and exploitation-free society) : সমাজতন্ত্র হল শোষণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ধনতন্ত্রে পুঁজিপতিরা মূলধনের মালিকানার জোরে শ্রমিক দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা পুঁজিপতি কর্তৃক শোষিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ নয়। এখানে মূলধনের সামাজিক মালিকানা। তাই এখানে পুঁজিপতি দ্বারা শ্রমিকের শোষণ থাকে না। উৎপাদনের ফল সকলেই ভোগ করে।

v) নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (Controlled or regulated economy) : সমাজতন্ত্র হল নিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি। ফলে এখানে ধনতন্ত্রের ন্যায় বাণিজ্যচক্রজনিত আয় ও নিয়োগের ওঠানামা থাকে না। ধনতন্ত্রের ন্যায় অবাধ অর্থনীতিতে বাজারি শক্তির প্রভাবে অনেক সময় মন্দা ও সংকট দেখা দেয়। সমাজতন্ত্রে তা ঘটে না কারণ এখানে অর্থনৈতিক শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পিত।

vi) অপচয়ের অনুপস্থিতি (Absence of wastage) : ধনতন্ত্রে একই বা একজাতীয় দ্রব্য অনেক উৎপাদক উৎপাদন করে। ফলে বিজ্ঞাপন, ফ্যাশান শো ইত্যাদিতে অনেক টাকা ব্যয়িত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে সরকারই একমাত্র উৎপাদক। এখানে প্রতিযোগিতার স্থান নেই। ফলে বিজ্ঞাপনের ন্যায় অপচয়মূলক কাজকর্ম ঘটে না।

vii) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic freedom) : সমাজতন্ত্রে বেকারত্ব নেই। এখানে সরকার প্রত্যেক নাগরিককে কাজ দিতে বাধ্য। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাওয়া মৌলিক অধিকার। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানে নিশ্চয়তা থাকে।

viii) কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন (Production of desirable goods) : ধনতন্ত্রে মুনাফার লোভে অনেক অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন ঘটে। সমাজতন্ত্রে তা হয় না। এখানে দেশের বা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কেবলমাত্র কাম্য দ্রব্যেরই উৎপাদন হয়ে থাকে।

১.৫.৩ সমাজতন্ত্রের দোষ

অনেক লেখক সমাজতন্ত্রের নানা দোষ বা কুফলের উল্লেখ করেছেন। সমাজতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি কুফল হল নিম্নরূপ:

i) অনুপ্রেরণার অভাব (Lack of incentive) : সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে না বলে লোকে কাজে অনুপ্রেরণা পায় না। কেউ কিছু বাড়তি উৎপাদন করলে সেটি তার নয়, সেটি সমাজের বা সবার। ফলে জনগণের উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়। ধনতন্ত্রে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় জনগণের উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা বাড়ে।

ii) আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা (Bureaucratic management) : সমাজতন্ত্রে পরিচালনা ব্যবস্থা খুবই আমলাতান্ত্রিক। এখানে ছোটোখাটো বিষয়েও সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাড়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়।

iii) রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত (Political decision) : সমাজতন্ত্রে রাজনীতির দ্বারা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। ফলে অনেক সিদ্ধান্তই ভুল হয়। কারণ অনেক সিদ্ধান্তের পেছনেই রাজনৈতিক মতাদর্শ কাজ করে, অর্থনৈতিক বিবেচনা নয়।

iv) দ্রব্যসামগ্রীর নিম্নমান (Low quality of goods) : সমাজতন্ত্রে সরকারই সব দ্রব্যের উৎপাদক। ফলে এখানে কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। আর প্রতিযোগিতা না থাকলে উৎকর্ষ নষ্ট হয়। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মান নিম্ন হয়।

v) ছদ্মবেশী বেকারত্ব (Disguised unemployment) : সমাজতন্ত্রে সবাই কাজ পায় বটে, তবে দক্ষ শ্রমিককে অনেক সময়ই কম দক্ষতার কাজ করতে হয়। একে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় পেশা নির্বাচনে ব্যক্তির কোনো স্বাধীনতা থাকে না।

vi) ক্রেতার সার্বভৌমত্ব হানি (Loss of consumers' sovereignty) : সমাজতন্ত্রে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টন নির্ধারণ করে সরকার বা সরকারের তরফে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ। এখানে ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দের বিশেষ গুরুত্ব নেই। ফলে ক্রেতাদের দ্রব্য নির্বাচনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। তেমনি, জনগণের পেশা নির্বাচনেরও কোনো স্বাধীনতা থাকে না।

১.৬ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তুলনা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র উভয়েরই নানা সুবিধা-অসুবিধা আছে। আমরা এই দুই ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করব।

❐ ধনতন্ত্রের গুণ এবং সমাজতন্ত্রের দোষ (Merits of capitalism and demerits of socialism) : সমাজতন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্রের কিছু বাড়তি সুবিধা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

i) ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক বিষয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে অনেক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা গৃহীত হয়।

ii) সমাজতন্ত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে সরকারের কাছে অনুমতি নিতে হয়। ফলে এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পায়। ধনতন্ত্রে এই অসুবিধা নেই।

iii) ধনতন্ত্রে বাজারি শক্তি উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করে, কিন্তু সমাজতন্ত্রে সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করতে হয়। এটি ব্যয়সাধ্য, শ্রমসাধ্য এবং জটিল। ধনতন্ত্রে পরিকল্পনা তৈরির সমস্যা নেই।

iv) সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় কোনো ভুল হলে তা বড় মাপের হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তা ছাড়া, এই ভুল নির্ণয় করা এবং তা সংশোধন করা খুবই জটিল। কিন্তু ধনতন্ত্রে বাজার ব্যবস্থা বা দাম ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং এই ভুলের সংশোধন করে দেয়।

v) ধনতন্ত্রে দাম ব্যবস্থা উপকরণের সর্বোত্তম বণ্টন ঘটায়। তা ছাড়া, এখানে দ্রব্যের ব্যয় তার দামে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে দাম হল আরোপিত দাম। এই দাম উৎপাদন ব্যয়কে প্রতিফলিত করে না। সমাজতন্ত্রে তাই দ্রব্যের দাম দেখে ব্যয় সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না।

vi) ধনতন্ত্রে ভোগীর স্বাধীনতা থাকে। সে তার পছন্দমতো দ্রব্য নির্বাচন করতে পারে। ফলে ভোগকারীর তৃপ্তি বেশি হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে জনসাধারণ পছন্দমতো দ্রব্য নির্বাচন করতে পারে না। ফলে তাদের তৃপ্তি কম হয়।

vii) ধনতন্ত্রে যার দক্ষতা বেশি, সে বেশি উপার্জন করে। ফলে এই ব্যবস্থায় উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা বাড়ে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে বেশি উৎপাদন করলে তা সমাজের বা সরকারের। তাই এখানে শ্রমিকের উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়।

viii) সমাজতন্ত্রে ভোগকারীর স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু ধনতন্ত্রে ভোগকারীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।

ix) ধনতন্ত্রে ব্যক্তি কোন্ ধরনের কাজ করবে তা তার নিজস্ব ইচ্ছা ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধনতন্ত্রে পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে পেশা নির্বাচনে ব্যক্তির কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এখানে ব্যক্তি কী কাজ

করবে তা সরকার ঠিক করে দেয়।

❐ **সমাজতন্ত্রের গুণ ও ধনতন্ত্রের দোষ (Merits of socialism and demerits of captalism) :** ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রের কিছু গুণ আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

i) সমাজতন্ত্র পরিকল্পিত অর্থনীতি। এখানে পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নির্ধারণ করা হয়। ফলে এই ব্যবস্থায় বাণিজ্যচক্রজনিত হ্রাস-বৃদ্ধির সংকট থাকে না। অন্যদিকে, ধনতন্ত্র হল অপরিকল্পিত অর্থনীতি। সেখানে বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দা ও সমৃদ্ধি চক্রকারে নিয়মিত ঘটতে থাকে।

ii) ধনতন্ত্রে ব্যক্তি তার দক্ষতা অনুযায়ী উপার্জন করে। ফলে এখানে আয় বণ্টনের তীব্র বৈষম্য দেখা দেয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে আয় বণ্টনের বৈষম্য তুলনায় অনেক কম।

iii) সমাজতন্ত্রে মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা থাকে না। ফলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণি সংঘর্ষ থাকে না। কিন্তু ধনতন্ত্রে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটে থাকে। সেখানে শ্রমিক পুঁজিপতি দ্বারা শোষিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এরূপ শ্রমিক শোষণ থাকে না।

iv) সমাজতন্ত্রে সম্পদের সামাজিক মালিকানা। এখানে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। ফলে খাজনা, সুদ প্রভৃতি অনুপার্জিত আয় (unearned income) থাকে না। কিন্তু ধনতন্ত্রে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বলে এধরনের অনুপার্জিত আয়ও থাকে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রে শ্রমের দ্বারা অর্জিত আয়ই (অর্থাৎ মজুরি) হল একমাত্র আয়।

v) সমাজতন্ত্রে বেকারি নেই, কিন্তু ধনতন্ত্রে সাধারণত বেকারির সমস্যা থাকে।

vi) ধনতন্ত্রে একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে তীব্র দারিদ্র্য। সমাজতন্ত্রে প্রকট দারিদ্র্য নেই।

vii) ধনতন্ত্রে বাজার দখলের প্রতিযোগিতা থাকে। ফলে সেখানে বিজ্ঞাপন, ফ্যাশান শো প্রভৃতি অপচয়মূলক ব্যয় ঘটে থাকে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া। ফলে এখানে বিজ্ঞাপন, ফ্যাশান শো প্রভৃতি অপচয়মূলক কাজকর্ম ঘটে না।

viii) ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি মূলধনের মালিক। শ্রমিকের মূলধন নেই। তাই তাকে পুঁজিপতির দেওয়া শর্তে কাজ করতে হয়। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে, তাকে শ্রমের ন্যায্য মূল্য দেয় না। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এরূপ শ্রমিক শোষণ থাকে না।

ix) ধনতন্ত্রে মুনাফার লোভে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা অনেক অকাম্য দ্রব্য উৎপাদন করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে মুনাফার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করা হয় না। সেখানে দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্য হল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ।

x) ধনতন্ত্রে উৎপাদকেরা নানা অসাধু পন্থার মাধ্যমে (যেমন, বাজারে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে) ক্রেতাকে বেশি দাম দিতে বাধ্য করে। এভাবে তারা ক্রেতাকে শোষণ করে এবং অস্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। সমাজতন্ত্রে সমাজ কল্যাণই সরকারের লক্ষ্য। তাই এখানে ক্রেতাকে শোষণ করার বা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করার প্রশ্নই ওঠে না।

উপসংহার (Conclusion) : দেখা যাচ্ছে, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থারই নানা দোষ-গুণ রয়েছে। ধনতন্ত্রের দোষগুলির উৎস হল বাজার ব্যবস্থার প্রতি অতিনির্ভরতা এবং পরিকল্পনাহীনতা। তাই ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে সীমিত আকারে পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হচ্ছে। বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির সংশোধন করাই এই পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য। তাই এগুলিকে সংশোধনমূলক পরিকল্পনা (corrective planning) বলা হয়। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগের কাজকর্মের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। তাই পুরোপুরি অবাধ অর্থনীতি (laissez faire economy) বলে এখন আর কিছু নেই। তার জায়গা নিয়েছে নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র (regulated capitalism)। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রের ত্রুটিগুলির উৎস হল বাজার ব্যবস্থার অভাব। তাই সমাজতন্ত্রের দোষত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সীমিত আকারে বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। অনেকে একে market socialism বা বাজার সম্বলিত সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। এভাবে দুই বিপরীত অর্থব্যবস্থা ধীরে ধীরে কাছাকাছি চলে আসছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থার মধ্যে পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হচ্ছে, আর সমাজতন্ত্র বা পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় বাজার প্রবর্তন করা হচ্ছে। এভাবে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান কমছে। Tinbergen মনে করেন যে, এই দুই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে পরস্পরের সাথে মিলে যাবে (converge)। তাঁর এই বক্তব্যকে convergence hypothesis বা সমাপতন প্রকল্প বলা হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধারা ও প্রকৃতি লক্ষ করলে Tinbergen-এর বক্তব্যের সমর্থন মেলে। অর্থাৎ দুই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বা ব্যবধান ক্রমাগত কমছে। তবে তারা পুরোপুরি মিলে যাবে কিনা অথবা এই মিলে যাওয়ার প্রক্রিয়া কতদিনে সম্পূর্ণ হবে তা কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

১.৭ সারাংশ

১. সামন্ততন্ত্র (Feudalism) : যে অর্থব্যবস্থায় কৃষিই প্রধান অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং যেখানে সামন্তপ্রভুরা ভূমিদাসদের দিয়ে কৃষিকার্য চালায় এবং উদ্বৃত্তের সবটাই আত্মসাৎ করে, সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্র বলে। সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (i) সামন্তপ্রভুদের বিভিন্ন স্তর, যেমন, মহারাজা, রাজা, জমিদার, জায়গিরদার প্রভৃতি। (ii) দাসব্যবস্থার দাসেরা এই ব্যবস্থায় ভূমিদাসে পরিণত, (iii) চাষ-আবাদের উল্লেখযোগ্য বিস্তার, (iv) জলশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার, (v) কৃষির

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নতুন নতুন কৃষিপণ্যের আবিষ্কার প্রভৃতি। সামন্ততন্ত্রের প্রধান কয়েকটি সুফল হল : (i) শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, (ii) কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসার, (iii) প্রাথমিক উদ্যোগপতিদের জোগান বৃদ্ধি, (iv) রাজদরবারে নানা শৌখিন দ্রব্যের চাহিদার ফলে হস্তশিল্পের প্রসার প্রভৃতি। তবে সামন্তবাদের কিছু দোষও ছিল। সংক্ষেপে সেগুলি হল: (i) ভূমিদাসেরা সামন্তপ্রভুদের দ্বারা শোষিত হত। (ii) কৃষির উদ্বৃত্ত কৃষির উন্নয়নে বিনিয়োজিত হয়নি। (iii) সামন্তপ্রভুরা বিলাসব্যসনে কৃষির উদ্বৃত্ত খাজনা বিনষ্ট করেছে।

২. ধনতন্ত্র (Capitalism) : মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্র হল এমন এক অর্থব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্রব্য ও সেবাকার্যের উৎপাদন সংগঠিত হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ফলে এই ব্যবস্থা প্রথম গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা আসলে এককথায় কারখানাভিত্তিক উৎপাদন। ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (i) উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা, (ii) ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব, (iii) উদ্যোগের স্বাধীনতা, (iv) অবাধ দাম ব্যবস্থা প্রভৃতি। ধনতন্ত্রের প্রধান গুণগুলি হল : ব্যক্তির স্বাধীনতা, দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা, উপকরণের দক্ষ বণ্টন, সর্বনিম্ন ব্যয়, নতুন দ্রব্য ও উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবনের সুযোগ, আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি প্রভৃতি। ধনতন্ত্রের প্রধান দোষ বা ত্রুটিগুলি হল : আয় বৈষম্য, বাণিজ্যচক্রের উপস্থিতি, অপচয়মূলক একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার, ক্রেতাদের স্বাধীনতা হানি, শ্রমিকের শোষণ, অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন, দাম ব্যবস্থার বিকৃতি, মুনাফাবাজি, সাম্রাজ্যবাদের প্রসার, অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রভৃতি।

৩. ধনতন্ত্রের প্রসার সম্পর্কে স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্ক্সের অভিমত (Opinions of Smith, Ricardo and Marx on Development of Capitalism) : অ্যাডাম স্মিথ ধনতন্ত্রকে অবাধ এবং নিয়ন্ত্রণহীন অর্থব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্যবস্থাই তাঁর নিকট সর্বোত্তম, কেননা তাহলেই সমাজের কল্যাণ সর্বাধিক হবে। স্মিথের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাঁর নিজের স্বার্থ বা লক্ষ্য পূরণ করতে চায়, তাহলে সমাজের কল্যাণও সর্বাধিক হবে। সুতরাং, ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ বা কল্যাণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তাই তিনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপের নিষেধ করেছেন। এখন, স্মিথের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় বা মূলধনের জোগান বাড়াতে হবে। সেজন্য শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ। এর জন্য আবার বাজার প্রসারিত করতে হবে। তার জন্য আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেশটির আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষায়ণ ঘটবে। এভাবে শ্রমবিভাগ, বিশেষায়ণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অবাধ অর্থনীতিটি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাবে বলে স্মিথ মনে করেন।

স্মিথের পর বিখ্যাত ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে জমিদার এবং পুঁজিপতির ভূমিকা পরস্পরের বিপরীত। জমিদারেরা তাদের উদ্বৃত্ত অনুৎপাদনশীল এবং বিলাসবহুল ভোগে ব্যয় করে। আর পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত বা মুনাফা মূলধন গঠনে ব্যয় করে। এখন, জনসংখ্যা বাড়লে চাষিদের মধ্যে চাষের জমি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ে। ফলে খাজনা বাড়ে অর্থাৎ জমিদারের আয় বাড়ে। জমিদাররা তাদের আয় অনুৎপাদনশীল ভোগে ব্যয় করে। মোট উৎপাদনে খাজনার অংশ বাড়ে এবং মুনাফার অংশ কমে। রিকার্ডোর তত্ত্বে, এর ফলে মুনাফার হার কমতে থাকে। এক সময় মুনাফার হার শূন্য হয়ে পড়ে। তখন মূলধন গঠন প্রক্রিয়া থেমে যায় এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিটি একটি নিশ্চল অবস্থায় (stationary state) পৌঁছায়। দেখা যাচ্ছে, ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রিকার্ডো এক হতাশাজনক (gloomy) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

কার্ল মার্ক্স ধনতন্ত্রের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি মূলধনের মালিকানার জোরে শ্রমিককে শোষণ করে। এক সময় পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করবে। তখন শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণির হাতে আসবে। তখন মূলধনের মালিক হবে রাষ্ট্র বা সমাজ। এভাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে। এই নতুন ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণি সংঘাত থাকবে না। মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণি সংঘাত, শ্রমিকের শোষণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বা আয় বৈষম্য, বেকারি প্রভৃতি। ধনতন্ত্রের এ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংকট ঘনীভূত হবে এবং এর ফলে ধনতন্ত্রের পতন ঘটবে। মার্ক্স দাবি করেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলি থাকবে না। তিনি সেজন্য সমাজতন্ত্রকে ধনতন্ত্র অপেক্ষা উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করতেন। অবাধ বা নিয়ন্ত্রণবিহীন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তীব্র বিরোধী ছিলেন মার্ক্স।

৪. **সমাজতন্ত্র (Socialism) :** যে ব্যবস্থায় দেশের সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা থাকে এবং উৎপাদন, বণ্টন ও দাম কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সংক্ষেপে সমাজতন্ত্র বলে। সমাজতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল : সম্পদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা, আরোপিত দাম পদ্ধতি, শ্রমিকের নিয়োগের অধিকার প্রভৃতি। সমাজতন্ত্রের প্রধান গুণগুলি হল : সমাজকল্যাণে অগ্রাধিকার, পরিকল্পিতভাবে সম্পদের ব্যবহার, সামাজিক সাম্য, শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ, নাগরিকের আর্থিক নিশ্চয়তা, কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রভৃতি। সমাজতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি দোষ হল : অর্থনৈতিক কাজকর্মে অনুপ্রেরণার অভাব, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা, কোনো সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থনীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য, দ্রব্যসামগ্রীর নিম্নমান, ছদ্মবেশী বেকারত্ব, জনগণের ভোগ্য দ্রব্য ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা

না থাকা প্রভৃতি।

৫. ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তুলনা (Comparison between Capitalism and Socialism) : সমাজতন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্রের সুবিধাগুলি হ'ল : ধনতন্ত্রে আর্থিক বিষয়ের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; আমলাতন্ত্র সামান্যই, বাজার ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন ও বণ্টন সমস্যার সমাধান, দাম ব্যবস্থার দ্বারা উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার, উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ইত্যাদি। পাশাপাশি, সমাজতন্ত্রে আর্থিক সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনীতির প্রভাব, আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য, জটিল ও ব্যয়বহুল পরিকল্পনার দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন এবং উপকরণের ব্যবহার ও বণ্টন, অনুপ্রেরণার অভাব প্রভৃতি।

আবার, ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রের কিছু সুবিধা আছে। সেগুলি হল—বাণিজ্যচক্রের অনুপস্থিতি, আয় বণ্টনে অধিকতর সাম্য, শ্রেণি সংঘর্ষের অনুপস্থিতি, সম্পদের কাম্য বণ্টন, বেকারি না থাকা, অপচয়মূলক বিজ্ঞাপন ব্যয় না থাকা প্রভৃতি।

ধনতন্ত্রের দোষগুলি দূর করার জন্য বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংশোধনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আর সমাজতন্ত্রের ত্রুটিগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে সীমিত আকারে বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। এভাবে দুটি বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছে।

১.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. রাজনৈতিক অর্থনীতি কাকে বলে?

২. Wealth of Nations কার লেখা? এটি কোন্ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

৩. Wealth of Nations বইটির পুরো নাম লিখুন।

৪. Principles of Political Economy and Taxation বইটি কার লেখা? এটি কোন্ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

৫. মার্ক্স বর্ণিত উন্নয়নের পাঁচটি স্তর কী কী?

৬. সামন্ততন্ত্র কাকে বলে?

৭. সামন্ততন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৮. সামন্ততন্ত্রে কয় ধরনের খাজনা দেখা যায় ও কী কী?

৯. সামন্ততন্ত্রের দুটি গুণ উল্লেখ করুন।

১০. সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুটি ত্রুটি উল্লেখ করুন।

১১. ধনতন্ত্র কাকে বলে?

১২. ধনতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য বলুন।

১৩. ধনতন্ত্রের দুটি গুণ উল্লেখ করুন।
১৪. ধনতন্ত্রের দুটি প্রধান ত্রুটি কী কী?
১৫. সমাজতন্ত্র কাকে বলে?
১৬. সমাজতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
১৭. সমাজতন্ত্রের দুটি প্রধান সুবিধা উল্লেখ করুন।
১৮. সমাজতন্ত্রের দুটি প্রধান অসুবিধা কী কী?
১৯. অদৃশ্য হাত কাকে বলে?
২০. অবাধ নীতি বলতে কী বোঝায়?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করুন।
২. সামন্ততন্ত্রের দুটি গুণ বর্ণনা করুন।
৩. সামন্ততন্ত্রের দুটি দোষ ব্যাখ্যা করুন।
৪. ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।
৫. ধনতন্ত্রের দুটি গুণ ব্যাখ্যা করুন।
৬. ধনতন্ত্রের দুটি দোষ আলোচনা করুন।
৭. ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে স্মিথের মতামত বর্ণনা করুন।
৮. ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মার্ক্সের অভিমত আলোচনা করুন।
৯. রিকার্ডো কীভাবে ধনতন্ত্রের নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছানো ব্যাখ্যা করেছেন?
১০. সমাজতন্ত্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
১১. সমাজতন্ত্রের দুটি ত্রুটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১২. সমাজতন্ত্রের দুটি গুণ বুঝিয়ে বলুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. সামন্ততন্ত্র কাকে বলে? সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।
২. সামন্ততন্ত্রের গুণগুলি লিপিবদ্ধ করুন। এর ত্রুটিগুলিই বা কী কী?
৩. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে? ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।
৪. ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুণগুলি আলোচনা করুন।
৫. ধনতন্ত্র কাকে বলে? ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি বর্ণনা করুন।
৬. ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্ক্সের অভিমত আলোচনা করুন।

৭. সমাজতন্ত্র কাকে বলে? সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৮. সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। সমাজতন্ত্রের গুণাবলি এবং এর ত্রুটিগুলি বর্ণনা করুন।

৯. ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দোষগুণ নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্ত (২০২০) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. ভট্টাচার্য, কল্যাণব্রত (২০০০) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : তত্ত্ব ও তথ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩. Bhattacharyya, H. (1990) : Economics of Underdevelopment, Calcutta Book House (P) Ltd.

৪. Desai, S.S.M. (1979) : Fundamentals of Economic Systems, Himalaya Publishing House.

৫. Sarkhel, Jaydeb, Seikh Salim & Anindya Bhukta (2017) : Economic Development : Institutions, Theory and Policy, Book Syndicate (P) Ltd.

৬. Thirlwall, A.P. (1986) : Growth and Development, ELBS/Macmillan.

একক ২ ❑ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে অবস্থান্তর বা উত্তরণ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব

২.৩.১ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

২.৩.২ বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা

২.৩.৩ মার্ক্সের স্তর তত্ত্বের মূল্যায়ন

২.৪ রস্টো-র স্তর তত্ত্ব

২.৪.১ রস্টোর স্তর তত্ত্বের মূল্যায়ন

২.৫ রস্টো বনাম মার্ক্স : স্তর তত্ত্বের তুলনা

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- উন্নয়নের স্তর তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?
- মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব ও তার সীমাবদ্ধতা
- রস্টোর স্তর তত্ত্ব এবং তার ত্রুটিসমূহ
- রস্টো এবং মার্ক্সের স্তর তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি বেশি গ্রহণযোগ্য

২.২ প্রস্তাবনা

কোনো দেশ তার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কতকগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় বলে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রচার করে, তাদের একযোগে স্তর তত্ত্ব বলা হয়। বিভিন্ন লেখক অর্থনৈতিক উন্নয়ণের বিভিন্ন স্তরক্রম

বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ তাঁর Wealth of Nations (1776) বইয়ে স্তর-বিভক্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত স্তর ক্রমটি ছিল শিকার, পশুপালন, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প। জার্মান অর্থনীতিবিদ ফ্রেডেরিখ লিস্ট (1789-1846) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি স্তর উল্লেখ করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে হল : আদিম বা বর্বর জীবনযাত্রা (savagery), পশুচারণভিত্তিক জীবনযাত্রা (Pastoral life), কৃষির প্রাধান্য (Predominance of agriculture), কৃষি ও শিল্পের সহ-উন্নতি (agriculture and manufacture) এবং অবশেষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক উন্নয়ন বা অগ্রগতি (agriculture, manufactures and trade)। সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক তথা অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্সও (1818-83) অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তরক্রম দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনো দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সেই পাঁচটি স্তর হল— আদিম সাম্যাবস্থা (primitive communism), দাসপ্রথা (slavery), সামন্ততন্ত্র (feudalism), ধনতন্ত্র (capitalism) এবং সমাজতন্ত্র (socialism)। মার্ক্সের পর উল্লেখযোগ্য স্তর তত্ত্ব হিসাবে আমরা কলিন ক্লার্ক-এর (1957) তত্ত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি। ক্লার্ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শ্রমের বণ্টনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, কোনো দেশে যতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে থাকে, ঐ দেশের জনসংখ্যার জীবিকা কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। উন্নয়নের প্রথম স্তরে শ্রম প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন আরও সম্পৃক্ত হলে এই দুই ক্ষেত্র থেকে শ্রম তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্রে গমন করে। শ্রমের এই ধরনের পুনর্বণ্টনের কথা বহু পূর্বেই স্যার উইলিয়াম পেটি একটি বক্তৃতায় (1690) উল্লেখ করেন। ক্লার্ক তাই জীবিকার ধরন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্কের কৃতিত্ব দিয়েছেন Sir William Petty-কে এবং এই সম্পর্ককে তিনি Petty's Law বলে উল্লেখ করেছেন। ক্লার্কের সমসাময়িক নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ এ.জি.বি. ফিসার (1895-1976)ও ক্লার্কের ন্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জীবিকা কাঠামোর অনুরূপ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেন। এজন্য উন্নয়নের সঙ্গে জীবিকা কাঠামোর এই পরিবর্তন বা ক্ষেত্রগত বণ্টনের তত্ত্বকে ক্লার্ক-ফিসার তত্ত্ব (Clark-Fisher Thesis) বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে নোবেল-বিজয়ী ধনবিজ্ঞানী সাইমন কুজনেৎস্ এই তত্ত্বের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন (1956) করেন। ক্লার্ক এবং ফিসারের পর উল্লেখযোগ্য স্তর তত্ত্ব দিয়েছেন রস্টো (W. W. Rostow)। তাঁর স্তর তত্ত্বে (1960) তিনি পাঁচটি স্তরক্রমের কথা বলেছেন। সেই পাঁচটি স্তর হল : চিরাচরিত সমাজ (traditional society), প্রাক্-উত্তোলন পর্ব বা উত্তোলনের পূর্বশর্তসমূহ (Pre-conditions for take off), উত্তোলনের স্তর বা পর্ব (take-off), সমৃদ্ধি বা পূর্ণ পরিণতির দিকে যাত্রা (drive to maturity) এবং উচ্চ গণভোগের স্তর (high mass consumption)। বর্তমান এককে আমরা অবশ্য দুটি প্রধান স্তর তত্ত্বের আলোচনা করব। একটি হল মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব এবং অপরটি হল রস্টোর স্তর তত্ত্ব। দুটি স্তর তত্ত্বের বর্ণনা এবং সামগ্রিক মূল্যায়নের পর এই দুটি তত্ত্বের দোষত্রুটি নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনাও বর্তমান এককে করা হবে।

২.৩ মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব

২.৩.১ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

কার্ল মার্ক্স বলেছেন যে, কোনো একটি দেশের অর্থনীতি তার উন্নয়নের পথে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। সেই পাঁচটি স্তরের ক্রম হল : আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। মার্ক্স একটি তত্ত্বের সাহায্যে অর্থনীতির এই অবস্থান্তর বা পর্বান্তরকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই তত্ত্বটির নাম হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism)। এটি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) নামেও পরিচিত। এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা হল উৎপাদনের রীতি বা ধরন (mode of production)। এটিই কোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি। এই উৎপাদনের রীতি আবার নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর। সেই বিষয় দুটি হল : উৎপাদনের শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদনের সম্পর্ক (relations of production)। মার্ক্সের মতে, এই দুই বিষয়ের নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দেশ এগিয়ে চলে। অর্থনীতিটির একটি স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তরণ ঘটে। সহজ কথায়, উৎপাদনের শক্তি বলতে উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভাবা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে কারিগরি সম্পর্ক। অন্যদিকে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক থাকে, তাকে ভাবা যেতে পারে উৎপাদন সম্পর্ক। এর মধ্যে রয়েছে দেশের রীতিনীতি, আইনকানুন, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি। এই উৎপাদনের সম্পর্কের ভিতরে উৎপাদনের শক্তি কাজ করে বা উৎপাদনের শক্তি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। উৎপাদনের সম্পর্ক যেন উৎপাদনের শক্তিকে ঘিরে বা আবৃত করে রাখে (embody)। উৎপাদনের শক্তির বিকাশের উপর উৎপাদন সম্পর্ক নির্ভর করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, উৎপাদনের শক্তি হল মূল বস্তু বা বিষয় (content), আর উৎপাদনের সম্পর্ক হল আঙ্গিক রূপ (form)। এই উৎপাদন সম্পর্কের ভিতরে বিরাজ করে উৎপাদনের শক্তি। উভয়ের সমন্বিত বা একত্রিত ব্যবস্থাকেই আমরা বলেছি উৎপাদনের রীতি বা ধরন (mode of production)। সুতরাং কোনো উৎপাদন ব্যবস্থায় বা উৎপাদনের রীতি বা ধরনের মধ্যে উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্ক একত্রে বিরাজ করে। এরা দুটি পৃথক ধারণা হলেও কোনো সমাজব্যবস্থায় এরা পৃথকভাবে বিরাজ করে না। এরা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এখন, মার্ক্সের মতে, উৎপাদনের শক্তি যত দ্রুত বিকাশ লাভ করে, উৎপাদনের সম্পর্ক তত দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারে না। উৎপাদনের শক্তি, উৎপাদনের সম্পর্ক অপেক্ষা বেশি গতিশীল (more dynamic)। ফলে নতুন উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে পুরনো উৎপাদনের সম্পর্কের একটা বিরোধ দেখা দেয়। পুরনো উৎপাদনের সম্পর্ক নতুন উৎপাদনের শক্তিকে তার কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ রীতিনীতি, আইন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে ধরে বা ঘিরে রাখতে (accommodate) পারে না। নতুন উৎপাদনের

শক্তির চাপে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং উন্নততর উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমাজটি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হয়। উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের পুনরায় সামঞ্জস্য ঘটে। উৎপাদনের শক্তি পুনরায় উৎপাদনের সম্পর্কের তুলনায় দ্রুত বিকাশ লাভ করে। পুনরায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ (contradiction) উপস্থিত হয়। একটা সময় আবার উৎপাদনের সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে নতুন উৎপাদনের সম্পর্ক সমাজে গড়ে ওঠে। মার্ক্সের মতে, এইভাবে উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই কোনো অর্থনীতির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এর দ্বারা মার্ক্স দেখিয়েছেন, কীভাবে একটি দেশ বা অর্থনীতি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আমরা আগেই বলেছি যে, মার্ক্সের এই তত্ত্বকে অনেকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) বলে অভিহিত করছেন। মার্ক্স কীভাবে এই দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (dialectical materialism) সাহায্যে তাঁর স্তর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, তা এখন আমরা আলোচনা করব।

২.৩.২ বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা

মার্ক্সের মতে, কোনো দেশের অর্থনীতি তার উন্নয়নের পথে পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে। নির্দিষ্ট পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে দেশটি অতিবাহিত হয়। এই পাঁচটি স্তর হল যথাক্রমে—আদিম সাম্যবাদ (primitive communism), দাস প্রথা (slavery), সামন্ততন্ত্র (feudalism), ধনতন্ত্র (capitalism) এবং সমাজতন্ত্র (socialism)। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশটির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে, তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism)। এই প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

মার্ক্সের মতে, কোনো অর্থনীতির উন্নয়নের যে-কোনো স্তরেরই নিজস্ব উৎপাদন রীতি বা ধরন (modes of production) আছে। এই উৎপাদন রীতি বা ধরন আবার দুটি বিষয় নিয়ে গঠিত : উৎপাদনের শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদনের সম্পর্ক (relations of production)। উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (embodied) থাকে উৎপাদনের শক্তি। উৎপাদনের সম্পর্ক যেন উৎপাদনের শক্তিকে ঘিরে রাখে। এখন, উৎপাদনের সম্পর্কের চেয়ে উৎপাদনের শক্তি বেশি গতিশীল। ফলে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের সামঞ্জস্যহীনতা বাড়তে থাকে। নতুন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ দেখা দেয়। মার্ক্সের মতে, এই সময়ে অর্থনীতিতে বিবর্তন বা অবস্থান্তর ঘটে। নতুন উৎপাদনী শক্তির চাপে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ক ভেঙে যায়। আবার এক নতুন উৎপাদনী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনীতিটি আর একটি উন্নততর স্তরে পৌঁছায় যা নতুন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে আর পুরনো সংঘাত থাকে না। আবার কিছুদিন পর উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন আবার পুরনো

উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। এভাবে উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ বা সংঘাতের আবির্ভাব ও তার বিলোপের মাধ্যমে অর্থনীতির প্রগতি বা উন্নয়নকে বলা হয় বিবর্তনবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (dialectical materialism)। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাধ্যমেই সমাজের পর্বান্তর (transition) ঘটে অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় অথবা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে বলে মার্ক্স মনে করেন। তাঁর মতে, এভাবেই কোনো দেশ আদিম সাম্যবাদ থেকে অবশেষে সমাজতন্ত্রে পৌঁছায়। আমরা মার্ক্সকে অনুসরণ করে কোনো অর্থনীতির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণকে এবার ব্যাখ্যা করব।

(i) আদিম সাম্যবাদ (Primitive communism) : মার্ক্সের স্তর ক্রমে এটিই হল প্রাথমিক স্তর। আদিম সাম্যাবস্থায় সবই ছিল সাধারণের সম্পত্তি। শিকার করা পশু, বন্য ফলমূল প্রভৃতির ছিল যৌথ মালিকানা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সহজ সমবায়। উদ্বৃত্ত শ্রম বা শোষণ বলে কিছু ছিল না। উৎপাদনের চরিত্রটি ছিল বিরূপতাহীন বা বিরুদ্ধতাহীন (non-antagonistic)। আদিম সাম্যবাদে এক একটি গোষ্ঠী (clan) বা দল যৌথভাবে পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করত। সেই খাদ্য সকলে মিলে ভাগ করে খেত। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে উৎপাদনের শক্তির বিকাশ ঘটতে লাগলো। যেমন, শ্রমবিভাগ দেখা দিল, মানুষ কৃষিবিদ্যা ও পশুপালন আয়ত্ত করল প্রভৃতি। এর ফলে এই উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত দেখা দিল। সেই উদ্বৃত্ত দখল করার জন্য সংঘাত ও শোষণ দেখা দিল। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতি (tribe) গড়ে উঠলো। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘাত শুরু হল। এভাবে আদিম সাম্যাবস্থায় উৎপাদনের চরিত্রটি আর বিরোধহীন (non-antagonistic) রইলো না, তা হয়ে পড়ল বিরোধী বা বিরূপ চরিত্রের, হয়ে দাঁড়াল বিরুদ্ধ চরিত্রের (antagonistic)। কৃষিকাজ ও পশুপালন শুরু হবার ফলে শ্রমের প্রয়োজন পড়ল। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে লাগলো। এই সংঘাতে বিজয়ী উপজাতিরা বিজিতদের নিয়ে এসে তাদের দিয়ে পশুপালন ও কৃষিকাজ করাতে লাগলো। তা ছাড়া, মানুষ এই স্তরে লোহার কিছু কিছু ব্যবহার শিখল। ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত লাঙল তৈরি করা সম্ভব হল। এইভাবে, যখনই উৎপাদনের শক্তির বিকাশ ঘটল, তখনই তার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের বিরোধ দেখা দিল। কৃষিজীবী এবং পশুপালক সমাজের উদ্ভবের ফলে বহু সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা বাড়লো। পুরনো উৎপাদনের সম্পর্ক সেই প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হল। ফলে সমাজে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক উদ্ভূত হল। সেই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাটি হল দাস ব্যবস্থা বা দাস প্রথা।

(ii) দাস প্রথা (Slavery) : এটি হল আদিম সাম্যবাদের পরবর্তী স্তর অর্থাৎ মার্ক্সের স্তর ক্রমের দ্বিতীয় স্তর। আমরা আগেই বলেছি, আদিম সাম্যাবস্থার শেষের দিকে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংঘাত বা মারামারি প্রায়ই লেগে থাকতো। জয়ী গোষ্ঠী পরাজিতদের বন্দী করে নিয়ে এসে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করত। এভাবে দাস ব্যবস্থার সূত্রপাত হল। প্রাচীন রোমে এক সময় দাস ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত রূপ গ্রহণ করে। দাস প্রথায় মানুষের দুটি শ্রেণি : একটি হল মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ এবং অপরটি হল দাস। স্বাধীন মানুষের দলে থাকে বিজয়ী ব্যক্তিরা এবং তাদের বংশধরেরা। আর দাসেরা হল পুরনো যুদ্ধবন্দী

ও তাদের বংশধরেরা। তারা ছিল ঐ স্বাধীন মানুষদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দাস মালিকরা দাসেদের যে-কোনো কাজে নিয়োগ করতে পারতো। চাষবাস, পশুপালন, ছোটোখাটো কলকারখানার কাজ ইত্যাদি সবই দাসদের দিয়ে করানো হত। এমনকি, দাস মালিকরা দাসদের গবাদি পশুর মতো কেনাবেচা করতে পারত। এই দাস ব্যবস্থা সভ্যতার ইতিহাসে কয়েক হাজার বছর টিকে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদনের শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। দাসদের উপর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। দাস ও দাস মালিকদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। দাস মালিকরা তখন দাসদের কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য হয়। এদিকে দিন দিন কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। কৃষিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়তে থাকে। এক সময় দাস মালিকরা উপলব্ধি করে যে, দাস শ্রমিক ব্যবহার করা লাভজনক নয় কারণ দাস শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা অনেক কম। এছাড়া, দাস ব্যবসায়ী এবং দাস মালিকদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। এসবের ফলে দাস প্রথা এক সময় ভেঙে পড়ে এবং তার স্থানে আসে সামন্ততন্ত্র।

সামন্ততন্ত্র (Feudalism) : মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে দাস ব্যবস্থার পরের স্তর হল সামন্ততন্ত্র। এটি মার্ক্সের স্তর বিভাজনে তৃতীয় স্তর। দাস ব্যবস্থার পতনের মধ্য দিয়েই সামন্ততন্ত্রের শুরু। সামন্ততন্ত্রে কৃষিই প্রধান অর্থনৈতিক কাজকর্ম। দাস মালিক এবং দাসেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দাস ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। দাস ব্যবস্থার পতনের ফলে দাসেরা সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাসে পরিণত হয়। এরা দাসব্যবস্থার দাসেদের মতো পরাধীন ছিল না অর্থাৎ সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। এই ভূমিদাসদের নিজেদের চাষ আবাদের জন্য কিছু জমি দেওয়া হত এবং তার বিনিময়ে এই ভূমিদাসেরা সামন্তপ্রভুদের জমিতে চাষ করতে বাধ্য থাকতো। ভূমিদাসেরা (serfs) স্বাধীন হলেও তাদের কিছু দায়িত্ব থাকতো এবং তারা ইচ্ছে মতো চাষের জমি ছেড়ে যেতে পারতো না। দাস ব্যবস্থা অপেক্ষা সামন্ততন্ত্র ছিল উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা। সামন্ততন্ত্রে কৃষি ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ছিল দাস ব্যবস্থা অপেক্ষা বেশি। ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই নানা ধরনের ছোটোখাটো কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রচলিত হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটতে থাকে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহার বাড়তে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে থাকে। কারখানায় উৎপাদন প্রসারিত হতে থাকে। কারখানায় কাজ করার জন্য স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন বাড়তে থাকে। কিন্তু সামন্তপ্রভুদের জমিদারিতে শ্রমিকেরা আবদ্ধ থাকলে তারা কারখানায় কাজ করতে আসতে পারে না। ফলে ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলে ভূমিদাস প্রথা ভেঙে পড়ে। শিল্পে নিয়োগের প্রয়োজন মেটাতেই ভূমিদাসদের স্বাধীন করে দেওয়া হল। শিল্পে উৎপাদনশীলতা বাড়তে লাগলো। এক সময় তা কৃষি অপেক্ষা অনেক বেশি হয়ে পড়ল। ফলে কৃষি অপেক্ষা শিল্প ও কলকারখানায় উৎপাদন করাই বেশি লাভজনক বলে দেখা দিতে লাগলো। ফলে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন শুরু হল—উদ্ভব হল ধনতন্ত্রের।

ধনতন্ত্র (Capitalism) : ধনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করে যন্ত্রের সাহায্যে কারখানায় বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন। এই সমাজব্যবস্থা হল শ্রেণি-বিভক্ত সমাজব্যবস্থা। এখানে রয়েছে দুটি প্রধান শ্রেণি : পুঁজিপতি ও শ্রমিক। পুঁজিপতিরা কারখানা বা মূলধনের মালিক। উৎপাদনের মাধ্যমগুলির মালিকানা পুঁজিপতির হাতে। শ্রমিকের কোনো মূলধন নেই। তাই তাকে জীবিকার তাগিদে পুঁজিপতির শর্তে শ্রম বিক্রি করতে হয়। আইনত শ্রমিক সম্পূর্ণ স্বাধীন। দাস প্রথার ন্যায় তারা দাসমালিকের সম্পত্তি নয়। আবার, সামন্ততন্ত্রের ভূমিদাসদের মতো সামন্তপ্রভুদের জমিতে কাজ করতেও বাধ্য নয়। সে স্বাধীনভাবে তার শ্রম বিক্রি করতে পারে। সে তার খুশিমতো শ্রম বিক্রি করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। কিন্তু সে আইনত সে স্বাধীন হলেও বাস্তবে সে স্বাধীন নয়। কেননা শ্রমশক্তি বিক্রি করা ছাড়া তার জীবিকা অর্জনের আর কোনো পথ নেই। মার্ক্স তাই এদের সর্বহারা শ্রেণি বলেছেন। মজুরি পাবার জন্যই পুঁজিপতির শর্তে তাকে কাজ করতে হয়। মার্ক্সের ভাষায় এরা তাই স্বাধীন হয়েও মজুরি-দাস (Wage slave)। শ্রমিক যা উৎপাদন করে তাতে তার কোনো অধিকার নেই। উৎপাদনের সবটাই পুঁজিপতির। শ্রমিক শুধু তার শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পায়।

মার্ক্সের মতে, শ্রমিক যা মজুরি পায় তা তার উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা কম। এই দুয়ের পার্থক্যকে মার্ক্স বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value)। পুঁজিপতি পুঁজির মালিকানার জোরে এই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক পুঁজিপতির দ্বারা শোষিত হয়। এখানেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদনের বিরোধী বা বিরুদ্ধ (antagonistic) চরিত্র। এই শোষণের জন্যই শ্রমিক-মালিক সংঘাতের উদ্ভব ঘটে। আবার, পুঁজিপতির লক্ষ্য হল শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করে তা পুনরায় বিনিয়োগ করা। ফলে পুঁজিপতির মূলধনের পরিমাণ আরো বাড়ে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মূলধন চয়ন (Capital accumulation)। এই মূলধন চয়ন যতই চলতে থাকে, মূলধনের আঙ্গিক গঠন বাড়তে থাকে অর্থাৎ মূলধনের যন্ত্রময়তা বাড়ে। মোট মূলধনের মধ্যে স্থির মূলধনের অনুপাত বাড়ে। এর ফলে মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেয়। এভাবেও ধনতন্ত্রে সংকট ঘনীভূত হয়। আবার, ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে, তার দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণির ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যকরণ (increasing immiserisation of the proletariat) প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণির ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হয়। বাজারে সমস্ত পণ্য বিক্রি হয় না। এর ফলেও ধনতন্ত্রে সংকটের উদ্ভব ঘটে। মার্ক্স একে বলেছেন "পণ্যের পূর্ণমূল্য তুলতে না পারার সংকট" (realisation crisis)। আবার, ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এখানে কোনো পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নেই। অসংখ্য ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা তাদের নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাজার বা চাহিদার অনুপাতে হয় না। ধনতন্ত্রের এই পরিকল্পনাহীনতার জন্য কোথাও অত্যুৎপাদন, কোথাও কম উৎপাদন হয়ে থাকে। ফলে ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দেয়। একে বলা হয় অসমানুপাতজনিত সংকট (disproportionality crisis)। এই সমস্ত সংকট ধনতন্ত্রের পতন নিয়ে আসে।

এই পতনের কারণ হল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিরোধ। মার্ক্সের মতে, এই বিরোধ বা সংকটের মূল কারণ হল মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা। সুতরাং মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা দূর করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুঁজিবাদে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। একসময় শ্রমিক শ্রেণি সংঘবদ্ধভাবে মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই সংগ্রামের পরিণামে শ্রমিক শ্রেণি জয়লাভ করে এবং পুঁজিপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করে (dethrone) এবং মূলধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়।

সমাজতন্ত্র (Socialism) : সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মূলধনের সামাজিক মালিকানা। মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা বিলুপ্ত হয়। এর ফলে ধনতন্ত্রে যে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তা বিলুপ্ত হয়। মূলধনের সামাজিক মালিকানার ফলে এই দুই বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে। তাদের মধ্যে বিরোধ আর থাকে না। সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে নতুন উৎপাদনী শক্তির আরো বিকাশ ঘটে। মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা না থাকায় শ্রমিক আর পুঁজিপতি শ্রেণি দ্বারা শোষিত হয় না। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিশ্রমে উপার্জন করে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক হল সহযোগিতার সম্পর্ক। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনের কাজটি পরিচালিত হয় বলে কোনো বিশেষ বিভাগে অতি উৎপাদন অথবা কম উৎপাদনের সমস্যা তৈরি হয় না। ফলে ধনতন্ত্রের ন্যায় আয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা ঘটে না। কোন্ দ্রব্য উৎপাদন হবে, কতটা উৎপাদন হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের তরফে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে থাকে। এসমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থাকে না। সামাজিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে এখানে উৎপাদন সম্পর্ক হল অ-বিরোধী (non-antagonistic)। তা ছাড়া, উৎপাদনের উপাদানের কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা বা শ্রেণি-মালিকানা থাকে না বলে কোনো শ্রেণি-সংঘর্ষ (class conflict) বা শ্রেণি-বিরোধ থাকে না। আদিম সাম্যবাদের ন্যায় সমাজতন্ত্র হল শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ। তবে মার্ক্সের মতে, সমাজতন্ত্রই কোনো অর্থনীতির শেষ পরিণতি নয়। সমাজতন্ত্রের শেষ লক্ষ্য হল সাম্যবাদ (communism) যেখানে মানুষের কোনো প্রকার শোষণ থাকবে না এবং মানুষ তখন প্রকৃতই মুক্ত (free) হবে। মার্ক্সের মতে, সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদের দিকে যাত্রার সময় রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হবে (state will wither away) এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার একনায়কত্ব (dictatorship of proletariat)। তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত শোষণহীন সমাজ।

২.৩.৩ মার্ক্সের স্তর তত্ত্বের মূল্যায়ন

মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে স্তর ক্রমটি হ'ল—আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। প্রতিটি স্তরেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মার্ক্সের মতে, উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে সংঘাতের ফলে অর্থনীতিটির এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তরণ (transition) ঘটে। মার্ক্স

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদের মাধ্যমে এই উত্তরণকে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্সের যুক্তি বা তত্ত্বটিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে।

মার্ক্স যে পাঁচটি স্তরের কথা বলেছেন, সেই স্তরগুলির প্রতিটির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন রীতি বা ধরন (modes of production)। এই উৎপাদনী রীতির আবার দুটি অংশ বা দুটি দিক। একটি হল উৎপাদনের সম্পর্ক এবং অপরটি হল উৎপাদনের শক্তি। উৎপাদনের সম্পর্ক বলতে দেশটির নানা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আইনকানুন, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বোঝায়। অন্যদিকে, উৎপাদনের শক্তি বলতে শ্রম ও মূলধনের ব্যবহারের পদ্ধতি, দেশের প্রযুক্তিগত অবস্থা ইত্যাদিকে বোঝায়। এই উৎপাদন শক্তিকে ঘিরে বা ধরে রাখে উৎপাদনের সম্পর্ক। এখন, মার্ক্সের মতে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এই উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। একই সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কেরও কিছু পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু সেই পরিবর্তন উৎপাদনী শক্তির বিকাশের তুলনায় ধীরগতিতে ঘটে। উৎপাদনী শক্তি অনেক বেশি গতিশীল উৎপাদনের সম্পর্কের তুলনায়। ফলে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে একটা বিরোধ বা সংঘাত তৈরি হয়। এক সময় পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক আর বিকশিত নতুন উৎপাদনী শক্তিকে ধরে রাখতে পারে না। নতুন উৎপাদনী শক্তির চাপে বা প্রভাবে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে যায়। সমাজে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা এখন নতুন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে আবার উৎপাদনী সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান ঘটে। আবার একসময় উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে নতুন আর একটি উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেশটির পুনরায় আর একটি স্তরে উত্তরণ ঘটে। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত এবং তার ফলে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব এবং দেশটির নতুন একটি স্তরে উত্তরণ এবং তার ফলে সংঘাতের সাময়িক অবসান—এই প্রক্রিয়াটিকেই মার্ক্স বলেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism) বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (dialectical materialism)। অনেকে এই তত্ত্বকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) বলে অভিহিত করেছেন। কেননা তাঁরা মনে করেন যে, মার্ক্সের এই তত্ত্ব গতির নিয়মাবলি (laws of motion) এবং ইতিহাসের ধারার কিছু নিয়ম মেনে চলে। তা ছাড়া, এই তত্ত্ব সমাজের অগ্রগতির ব্যাখ্যা দিতে বস্তুগত বিষয়ের (material causes) উপর নির্ভর করেছে। তাঁরা এই তত্ত্বকে তাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে দাবি করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে মনে করেন, আর মার্ক্স এই তত্ত্বের সাহায্যেই দেখিয়েছেন কীভাবে একটি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে এবং কীভাবে একটি দেশ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে।

তবে এ সমস্ত দাবি সত্ত্বেও একথা বলতেই হয় যে, মার্ক্সের স্তর তত্ত্বেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমরা সেই সীমাবদ্ধতাগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করতে পারি।

১. অনেকে মনে করেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাস হল প্রযুক্তিবিদ্যার রূপান্তরের ইতিহাস। আর প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি বা রূপান্তর অনেকটাই স্বয়ম্ভূত। এই স্বয়ম্ভূত প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটেছে। তাঁরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী

সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানব সমাজে রূপান্তর ঘটেছে একথা ঠিক নয়।

২. মার্ক্সের মতে, উৎপাদনী সম্পর্ক, উৎপাদনী শক্তির উপর নির্ভর করে। এই কথাটি মেনে নিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উৎপাদনী শক্তি যান্ত্রিকভাবে উৎপাদন সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। আসলে, উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদনী সম্পর্ক একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং তারা একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩. অনেকে মনে করেন যে, উৎপাদনের সম্পর্ক ও উৎপাদনের শক্তিকে বাস্তবে পৃথক করা যায় না। তারা একইসঙ্গে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়।

৪. অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয়ের দ্বারা কোনো সমাজের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করা যায় না। তা ছাড়া, ভৌত বা বস্তুগত বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট বস্তুমুখী নিয়ম নেই।

৪. মার্ক্সের তত্ত্বে, সমাজের কোনো একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে সংঘাতের উদ্ভবের ফলে। অবশেষে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে এই সংঘাত বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রেও মানুষে মানুষে নানা ধরনের সংঘাত জন্ম নিতে পারে। সেই সংঘাত কীভাবে মেটানো যাবে অথবা সেই সংঘাতের পরিণাম কী হবে, সে সম্পর্কে মার্ক্সের তত্ত্বে কিছু বলা হয়নি।

৫. মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, সামন্ততন্ত্রের পর ধনতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্র আসে। কিন্তু পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্রের পরেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

৬. মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস, মেধা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, রাজনৈতিক মতবাদ, শিল্প ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ও সমাজের গতিপথকে প্রভাবিত করে। অনেকে মনে করেন যে, মার্ক্স তাঁর স্তর তত্ত্বে এই সমস্ত বিষয়কে অবহেলা করেছেন। অবশ্য এই সমালোচনা পুরোপুরি ঠিক নয়। সমাজের বিকাশ সম্পর্কে মার্ক্সের তত্ত্বে দুটি বিশেষ ধারণার কথা বলা আছে। একটি হল ভিত্তি বা base এবং অপরটি হল উপরি-কাঠামো বা superstructure। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক মতবাদের প্রসার ইত্যাদিকে মার্ক্স এই উপরিকাঠামো বা superstructure বলেছেন এবং এগুলি সমাজের গতিপথকে প্রভাবিত করে বলে মার্ক্স মন্তব্য করেছেন।

৭. মার্ক্সকে অনেকে ভুল ভবিষ্যদ্রষ্টা বলে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ধনতন্ত্রের নানা অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে এর পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাস্তবে পূর্ব ইউরোপ এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। আর নানা অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও ধনতন্ত্র টিকে আছে। এই অর্থব্যবস্থার পতন তো হয়ইনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি ঘটেছে।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় যে, মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধনতন্ত্রের শোষণমূলক চরিত্র, এর নৈরাজ্য (anarchy), এর অকল্যাণকর বা বিরোধী (antagonistic) উৎপাদন ব্যবস্থাকে এই তত্ত্বে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করে শোষণ করে। এর পিছনে কারণ হল মূলধনের ব্যক্তিগত বা শ্রেণি-মালিকানা। মূলধনের শ্রেণি মালিকানা দূর করে

সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করলে তবেই এই শোষণ দূর হবে। তার জন্য শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মূলধনের সামাজিক মালিকানা বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে এই বিষয়টি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৪ রস্টো-র স্তর তত্ত্ব

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ Walt Whitman Rostow তাঁর Stages of Economic Growth (1960) বইয়ে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তরক্রম বর্ণনা করেছেন। এই মডেলটিকে অর্থনৈতিক প্রসারের একটি অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক মডেল বলে অনেকে মনে করেন। রস্টো-র মতে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি স্তরক্রম বা পর্যায় আছে। সেই পাঁচটি স্তর হল (১) চিরাচরিত সমাজ (Traditional society), (২) উত্তোলন পর্বের পূর্বশর্তসমূহ (Pre-conditions for take-off), (৩) উত্তোলন পর্ব (Take-off), (৪) সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর বা যাত্রা (Drive to maturity) এবং (৫) উচ্চ গণভোগের স্তর বা যুগ (Age of high mass consumption)। আমরা রস্টো-কে অনুসরণ করে এই পাঁচটি স্তর বর্ণনা করবো। এই পাঁচটি স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) চিরাচরিত সমাজ (Traditional Society) : রস্টোর মতে, চিরাচরিত সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত। এরূপ সমাজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিউটন-পূর্ববর্তী যুগের (Pre-Newtonian)। এখানে কলাকৌশল ও মানসিকতা চিরাচরিত ধরনের। এরূপ সমাজে কৃষিযোগ্য জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে আরো জমিকে কৃষির অধীনে আনা যাবে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সমস্ত সুযোগসুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করা হয়নি। ফলে বাণিজ্যের মাত্রাও বৃদ্ধি করা সম্ভব। কলকারখানা তৈরিরও সুযোগ আছে। এককথায়, এই চিরাচরিত সমাজে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এককথায়, এরূপ সমাজে উন্নয়নের সুযোগ আছে। কিন্তু এখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিউটন-পূর্ববর্তী যুগের। ফলে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের অভাব রয়েছে। এর ফলে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার করে উৎপাদনের স্তর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। অধ্যাপক রস্টো চিরাচরিত সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি একাধারে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(i) নিউটনের আগের যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত।

(ii) এই সমাজ প্রধানত কৃষিভিত্তিক। শ্রম সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের বড় অংশই (75% বা তার বেশি) কৃষিতে নিযুক্ত।

(iii) এই সমাজে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির হার একটা নিম্নস্তরে আটকে থাকে।

(iv) সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। ফলে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামাজিক চলনশীলতা খুবই সীমিত।

(v) জমিজায়গা ও ধনসম্পত্তির পরিমাণের দ্বারাই রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। সুতরাং জমির বড় বড় মালিকদের হাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত।

(vi) এই সমাজে সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের মাত্র 5% বা তার কম।

(vii) জনগণের বড় অংশই নিয়তিবাদে বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, কোনো ব্যক্তির অবস্থা তার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে এবং সেটি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকেই বোঝা যায়, কেন চিরাচরিত সমাজে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম এবং কেন তা ঐ নিম্নস্তরেই আবদ্ধ। অধ্যাপক রস্টো-র মতে, নিউটনের পূর্ববর্তীকালের সমস্ত দেশকেই এই চিরাচরিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে ভাবা যেতে পারে। চিন রাজবংশের অধীনে চৈনিক জীবনযাত্রা, মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের প্রাক্-নিউটন যুগের সভ্যতা, মধ্যযুগের ইউরোপীয় দেশসমূহ প্রভৃতিকে চিরাচরিত সমাজের উদাহরণ হিসাবে ভাবা যেতে পারে।

(২) উত্তোলন পর্বের পূর্বশর্তসমূহ বা প্রাক্-উত্তোলন পর্ব (Pre-conditions for take off) : রস্টো-র স্তর ক্রমে এটি হল দ্বিতীয় স্তর। প্রকৃতপক্ষে এটি হল রূপান্তরের একটি পর্যায়। এই পর্যায় আসলে অর্থনীতিটির উত্তোলন পর্বে যাবার প্রস্তুতির স্তর। এই স্তরে স্ব-চালিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিগুলির উদ্ভব এবং সমাবেশ ঘটতে থাকে। তাই এই স্তরকে বলা যেতে পারে উত্তরণের পূর্বশর্ত সৃষ্টির স্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(i) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের 10%-এর আশেপাশে দাঁড়ায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল, মাথাপিছু আয় বাড়ে।

(ii) সামাজিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠে।

(iii) ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

(iv) কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত 75% থেকে 40%-এর কাছাকাছি নেমে আসে।

(v) সামাজিক চলনশীলতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

(vi) জমিদারদের প্রতিপত্তি কমতে থাকে এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এভাবে স্বয়ংচালিত উন্নয়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়। নিয়তিবাদে বিশ্বাস কমতে থাকে। আর্থিক উন্নয়ন

যে সম্ভব, সেই ধারণা প্রসার লাভ করে। শিক্ষার, বিশেষত আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণির উদ্ভব ঘটতে থাকে। তারা সঞ্চয় সংগ্রহ করে ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সেই সঞ্চয় বিনিয়োজিত হয়, বিশেষত পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। আধুনিক কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকে। এভাবে স্ব-চালিত উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। রস্টো-র মতে, স্ব-চালিত উন্নয়নের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। সেই তিনটি শর্ত হল—

(ক) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি। এর ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বাড়বে।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এর ফলে কৃষি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা এবং শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে পারবে।

(গ) মূলধনি দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বাড়বে।

প্রাক্-উত্তোলন পর্বে এই শর্তগুলি পূরিত হয়। ফলে দেশটি উত্তোলন পর্বের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায়।

৩. উত্তোলন পর্ব (Take-off) বা উত্তরণের স্তর (Take-off stage) : রস্টো-র স্তর ক্রমে উত্তোলন পর্ব বা উত্তরণের স্তর হল তৃতীয় স্তর। এটি রস্টোর স্তর তত্ত্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি, উন্নয়ন রেখার খাড়া ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মে দ্রুত গতিশীলতা। এর ফলে উন্নয়ন কিছুদিনের মধ্যেই স্বচালিত ও স্ববহনক্ষম হয়ে ওঠে। অর্থনীতিটি অনুন্নতির বাধা ছিঁড়ে দ্রুত গতিতে উন্নয়নের দিকে চালিত হয়। অর্থনীতির এই গতিসঞ্চার কোনো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে হতে পারে। যেমন, গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের শুরুতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে (1775-1800) এরূপ ঘটেছিল। আবার, এই উত্তোলন পর্ব কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে ঘটতে পারে। যেমন, তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ঘটেছিল। আবার, চিনে 1946 সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই উত্তোলন পর্ব শুরু হয়। অর্থনীতিবিদ রস্টো-র মতে, উত্তোলন পর্বের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) নিট জাতীয় উৎপাদনের 10% বা তার বেশি উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহার করা;

(খ) উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা যা উন্নয়নের প্রেরণাকে কাজে লাগাবে এবং উন্নয়নকে স্বয়ংচালিত করে তুলবে।

(গ) এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ যেগুলির উন্নয়নের হার বেশ উচ্চ। অধ্যাপক

রস্টো এধরনের শিল্পক্ষেত্রকে নেতৃস্থানীয় ক্ষেত্র (leading sector) বলে অভিহিত করেছেন। এরা দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির প্রধান কাঠামো—অর্থনীতির মেরুদণ্ড। রস্টো এদের বলেছেন analytical bone structure। এই শিল্পগুলি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। এদের প্রসারের ফলে সংযোগ প্রভাবের দ্বারা অগ্রবর্তী শিল্পও প্রসার লাভ করবে। আবার, নেতৃস্থানীয় শিল্পের প্রসারের ফলে এদের পিছনের শিল্পগুলিও প্রসার লাভ করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি লৌহ-ইস্পাত শিল্প কোনো দেশের নেতৃস্থানীয় শিল্প হয়, তাহলে এর প্রসারের ফলে মেশিনারি উৎপাদনকারী শিল্প প্রসার লাভ করবে। তেমনি, লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রসারের ফলে কয়লা শিল্পেরও প্রসার ঘটবে। রস্টো তিন ধরনের নেতৃস্থানীয় শিল্পক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—(ক) প্রাথমিক উন্নয়ন ক্ষেত্র, (খ) সহায়ক বা অনুপূরক উন্নয়ন ক্ষেত্র এবং (গ) উদ্ভূত উন্নয়ন ক্ষেত্র।

কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পই যে সব দেশে নেতৃস্থানীয় শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে তার কোনো মানে নেই। যেমন, গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবে তুলাবস্ত্র শিল্প নেতৃস্থানীয় শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আবার, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় রেলপথের প্রসার ঐ দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আবার, সুইডেনে কাঠচেরাই (timber industry) সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের শুরুতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। আবার, আধুনিক কৃষিখামারও কোনো দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দান করতে পারে। যেমন, ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ডের প্রাথমিক উন্নয়নের উর্ধ্বগতি সূচিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক প্রথায় ডিম, মাংস ও মাখন উৎপাদনের দ্বারা। সুতরাং উত্তোলন পর্ব শুরুর কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই। দেশের কোন্ ক্ষেত্রটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানকারী শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তা নির্দিষ্ট করে বা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে কোনো শিল্পকে নেতৃস্থানীয় শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে কয়েকটি বিষয় শিল্পটির অনুকূলে থাকতে হয়। রস্টো-র মতে নেতৃস্থানীয় বা অগ্রণী শিল্পের দ্রুত বিকাশের জন্য চারটি বিষয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। সেই চারটি বিষয় হল : (ক) ঐ শিল্পটির উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তীর্ণ বাজার থাকতে হবে। নতুবা শিল্পটির প্রসার বাজারের অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(খ) শিল্পটিতে নতুন উৎপাদন কৌশলের প্রবর্তন হতে হবে। তবেই শিল্পটির উৎপাদন দ্রুতহারে বাড়বে।

(গ) এই অগ্রণী শিল্পের উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন থাকতে হবে। নতুবা মূলধনের অভাবে শিল্পটির প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(ঘ) অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী পরিপূরক শিল্পের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। অগ্রবর্তী শিল্প নেতৃস্থানীয় শিল্পটির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করবে। আর পশ্চাৎবর্তী পরিপূরক শিল্প নেতৃস্থানীয় শিল্পটিকে উপাদান ও কাঁচামাল জোগান দিয়ে সাহায্য করবে। এভাবে উৎপন্নের চাহিদা ও উপাদানের জোগান নিশ্চিত হলে নেতৃস্থানীয় শিল্পটির অগ্রগতি দ্রুততর হবে।

অর্থনীতিবিদ রস্টো তাঁর Theory of Stages of Growth বইয়ে বিভিন্ন দেশের উত্তোলন পর্ব কাল বা উত্তরণ কাল চিহ্নিত করেছেন। নীচের সারণিতে আমরা তা দেখিয়েছি :

সারণি : প্রধান কয়েকটি দেশের উত্তরণ কাল

দেশ	উত্তোলন পর্ব কাল
গ্রেট ব্রিটেন	1783-1802
ফ্রান্স	1830-1860
বেলজিয়াম	1833-1860
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	1843-1860
জার্মানি	1850-1873
সুইডেন	1868-1890
জাপান	1878-1900
রাশিয়া	1890-1914
কানাডা	1896-1914
ভারত ও চিন	1952

৪. **সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর বা যাত্রা (Drive to Maturity) :** রস্টো-র তত্ত্বে এই স্তরটি হল দীর্ঘকালীন স্বয়ংচালিত উন্নয়নের স্তর। এই স্তরে অর্থনীতিটি নিয়মিত বিকাশ লাভ করতে থাকে। দেশটি আধুনিক কলাকৌশলের সফল প্রয়োগ ঘটায়। পুরনো উৎপাদন কৌশল বিলুপ্ত হয়। তার স্থলে আসে নতুন উন্নত কলাকৌশল। পূর্বের নেতৃস্থানীয় শিল্প আর নেতৃস্থানীয় থাকে না। তার স্থলে আসে নতুন নেতৃস্থানীয় শিল্প। এই স্তরে জাতীয় আয়ের 10% থেকে 20% বিনিয়োজিত হয়। ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার সর্বদাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে যথেষ্ট বেশি থাকে। এর তাৎপর্য হল মাথাপিছু আয়ের এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত বৃদ্ধি। রস্টো বর্ণিত এই স্তরে উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। নতুন নতুন শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। তারা এখন পুরনো শিল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করে। যেমন, গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের প্রথম দিকে তুলাবস্ত্র শিল্প ছিল নেতৃস্থানীয় শিল্প। কিন্তু পরে, শিল্পবিপ্লবের পরিপূর্ণতার স্তরে, কয়লা শিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প এবং রেলপথের গুরুত্ব তুলা বস্ত্র শিল্প অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, এই স্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যেও বৈচিত্র্য আসে। আগে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করা হতো, তা এখন দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। আবার, লোকের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ার ফলে নতুন নতুন আমদানি দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে তাল রাখার জন্য নতুন নতুন রপ্তানি পণ্যও তৈরি হয়। আমদানি ব্যয় মেটাতে রপ্তানি আয়ও বাড়াতে হয়। এক কথায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়ে এবং এই বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আসে। রস্টো-র মতে, উত্তোলন পর্বের শুরু থেকে প্রায় ৬০ বছর পরে এই পরিপূর্ণতার

স্তর বা সমৃদ্ধির দিকে যাত্রার স্তর শুরু হয়। এই স্তরে অর্থনীতিটি কৃৎকৌশলের অগ্রগতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। অধ্যাপক রস্টো কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে এই কৃৎকৌশলগত স্বনির্ভরতা অর্জনের বছর নির্দেশ করেছেন। নীচের সারণিতে আমরা কয়েকটি দেশের এই স্বনির্ভরতা অর্জনের বছর দেখিয়েছি।

সারণি : স্বনির্ভরতা অর্জনের বছর

দেশ	বছর
গ্রেট ব্রিটেন	1850
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	1900
জার্মানি	1910
ফ্রান্স	1910
সুইডেন	1930
জাপান	1940
কানাডা	1950
রাশিয়া	1950

রস্টো-র মতে, সমৃদ্ধির দিকে যাত্রার স্তরে অর্থনীতিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। সংক্ষেপে সেগুলি হল—

(i) শ্রমিক শ্রেণির দক্ষতা বৃদ্ধি।

(ii) দক্ষ ও কুশলী পরিচালক শ্রেণির উদ্ভব।

(iii) আরো কৃৎকৌশলগত উন্নতির জন্য জনগণের চাহিদা।

(iv) শ্রমিকের কৃষি থেকে অকৃষিক্ষেত্রে (শিল্প ও বাণিজ্যে) স্থানান্তর।

(v) অকৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকের মেধাভিত্তিক বা বৌদ্ধিক কাজকর্মে (White collar jobs) স্থানান্তর।

সমৃদ্ধির দিকে যাত্রার স্তরের শেষের দিকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

(ক) শ্রমিক শ্রেণির গঠন, আয়, আয়তন, কর্মদক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সবেতেই পরিবর্তন আসে। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, কৃষিতে জনসংখ্যার অনুপাত 20%-এ নেমে আসে। শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ হয়ে মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর প্রবণতা বাড়ে।

(খ) অর্থনীতির নেতৃত্বের প্রকৃতি বদলে যায়। যৌথ মূলধনি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের স্থান দখল করে দক্ষ প্রশাসক এবং পেশাদার ম্যানেজাররা।

(গ) দীর্ঘদিন ধরে শিল্পায়ন চলতে থাকার ফলে শিল্পায়নের জৌলুস মানুষের কাছে কিছুটা ফিকে হতে থাকে। জনগণের কাছে শিল্পায়ন কিছুটা একঘেয়ে লাগতে থাকে। ফলে শিল্পায়নের বিরুদ্ধে, বিশেষত দ্রুত ও আগ্রাসী শিল্পায়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে।

৫. উচ্চ গণভোগের স্তর (Stage of High Mass Consumption) : অধ্যাপক রস্টো বর্ণিত স্তর ক্রমের শেষ এবং অন্তিম স্তর হল উচ্চ গণভোগের স্তর। এই স্তরে সমাজের মনোযোগ উৎপাদনের সমস্যা থেকে ভোগ ও কল্যাণের সমস্যার দিকে সরে যায়। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পরিপূর্ণতার স্তরে বা সমৃদ্ধির দিকে যাত্রার স্তরে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর জোগানের সমস্যা নেই। বরং এই বিপুল জোগান কাটাবার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাই এই শেষ স্তরে সমাজের মনোযোগ জোগান থেকে চাহিদার দিকে সরে যায়। এই স্তরে তাই জনগণের ভোগ ও কল্যাণবৃদ্ধির দিকে জোর দেওয়া হয়। লোকের ভোগ প্রবণতা বাড়লে তবেই চাহিদা বাড়বে এবং বাড়তি জোগানের কাটতি হবে। জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য পদক্ষেপগুলি হল—

(ক) কল্যাণব্রতী সরকার প্রতিষ্ঠা। এই সরকার প্রগতিশীল করের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের চেষ্টা করবে। এর ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের আয় ও ভোগ বাড়বে।

(খ) জনগণের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটানো এবং উচ্চমানের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা। এই স্তরে জনগণের নতুন নতুন ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। গৃহস্থালির কাজকর্মে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ে। এভাবে নানা বিচিত্র ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির কাজকর্ম সেই চাহিদা মেটানোর দিকে চালিত হয়। নেতৃস্থানীয় শিল্পগুলি উন্নততর ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে বেশি বেশি ঝোঁকে।

(গ) আন্তর্জাতিক স্তরে দেশটির প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে উপযুক্ত সরকারি নীতি প্রণয়ন করা এবং তা অনুসরণ করা। দেশটি নানা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলে অথবা ঐ জাতীয় সংগঠনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উচ্চ গণভোগের স্তরে মানুষের শিল্পের প্রতি কিছুটা বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। এই স্তরে মানুষ শিল্পনগরী ছেড়ে শহরতলির দিকে বসবাস শুরু করে। অপেক্ষাকৃত শান্ত জীবন, শহরের কোলাহল ও দৌড়ঝাঁপ থেকে অব্যাহতি, দূষণমুক্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার আকর্ষণ ইত্যাদিই এর প্রধান কারণ।

রস্টো মনে করেন যে, 1920 সালের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এরূপ উচ্চগণভোগের দেশের আদর্শ উদাহরণ। তিনি আরো বলেছেন যে, 1950 সালের পর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপান এই উচ্চ গণভোগের স্তরে প্রবেশ করেছে। এই স্তরে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে এবং দেশের মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

২.৪.১ রস্টো-র স্তর তত্ত্বের মূল্যায়ন

অধ্যাপক রস্টো প্রবর্তিত স্তর তত্ত্বের নানা সীমাবদ্ধতা আছে। বিভিন্ন লেখক তাঁর তত্ত্বের নানা সমালোচনা করেছেন। সংক্ষেপে সেই সমালোচনাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, রস্টো তাঁর স্তর তত্ত্বে পাঁচটি স্তরের উল্লেখ করেছেন এবং এই পাঁচটি স্তরের প্রত্যেকটির কিছু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কীভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে অর্থনীতিটির উত্তরণ ঘটে তার কোনো ব্যাখ্যা রস্টো দেননি।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি স্তরের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পর্ক কীরূপ, তার কোনো আলোচনা রস্টোর স্তর তত্ত্বে নেই।

তৃতীয়ত, রস্টোর তত্ত্বে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য বা সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কোনো স্তরের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যা পূর্ববর্তী স্তরে বা পরবর্তী স্তরেও দেখা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন (mutually exclusive) নয়। তারা অনেক ক্ষেত্রে একে অপরের উপর চেপে থাকে (overlapping)। যেমন, উত্তোলন পর্বের পূর্বশর্তের স্তর এবং উত্তোলন পর্বের স্তরের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়।

চতুর্থত, কীভাবে অর্থনৈতিক এবং অন্-অর্থনৈতিক বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কোনো অর্থনীতির উন্নয়ন বা প্রসার ঘটে, তার কোনো ব্যাখ্যা রস্টো-র তত্ত্বে নেই।

পঞ্চমত, অধ্যাপক কুজনেৎস্ (Kuznets) রস্টো তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রস্টো বর্ণিত স্তরগুলির পরিসংখ্যানগত পরিমাপযোগ্য (statistically measurable) কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কুজনেৎস বহু তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে, রস্টো-র তত্ত্ব নানা ভ্রান্ত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রস্টো বিভিন্ন স্তরে মূলধন গঠনের বা বিনিয়োগের হার সম্পর্কে যে মান ধরে নিয়েছেন, তা অনেক দেশের বাস্তব তথ্যের সঙ্গে মেলে না বলে কুজনেৎস মত প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া, রস্টো সর্বদাই মূলধন-উৎপন্নের প্রান্তিক অনুপাত 5:1 ধরে নিয়েছিলেন। কুজনেৎস-এর মতে, এটিও সব দেশে সব স্তরে সমান থাকে না।

ষষ্ঠত, অনেকে মনে করেন যে, রস্টো-র তত্ত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে (pattern) ফেলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেশে দেশে ভিন্ন হতে বাধ্য কারণ সব দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ব্যবস্থা একরকম নয়।

এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করলে রস্টো-র স্তর তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে অভিহিত করা যায় না। অধ্যাপক রস্টো-র (1960) বহু পূর্বে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্স (1818-83) অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তর তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। সেই তত্ত্বে কীভাবে একটি অর্থনীতির

বিকাশ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয় তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখলে মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। রস্টো-র স্তর তত্ত্বের এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তিনি শুধু বিভিন্ন স্তরের কিছু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। সেদিক থেকে দেখলে রস্টোর স্তর তত্ত্ব সমাজের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা মাত্র—এটি কোন স্তর 'তত্ত্ব' নয়।

২.৫ রস্টো বনাম মার্ক্স : স্তর তত্ত্বের তুলনা

রস্টো ও মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি বা তাত্ত্বিক ভিত্তি পৃথক। তবুও এই দুই তত্ত্বের মধ্যে দু'একটি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন, (1) উভয়েই সমাজের বিবর্তন বা পর্বান্তর ব্যাখ্যা করতে মূলত অর্থনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করেছেন। উভয়েই ধরে নিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক বিষয়গুলিই রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত করে। (2) উভয়েই অনুভব করেছেন যে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ ক্রমাগত উন্নততর স্তরের বা অবস্থার দিকে যাত্রা করবে।

তবে উভয় তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(1) মার্ক্সের তত্ত্বে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দ্বারা সমাজের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রস্টো-র তত্ত্বে এরূপ কোনো স্তর তত্ত্ব নেই। তিনি শুধু প্রতিটি স্তরের কিছু অর্থনৈতিক ও কিছু অন্-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।

(2) মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে আমরা উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত বা বিরোধ দেখতে পাই। এই সংঘাতের ফলেই পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ক ভেঙে পড়ে এবং নতুন উৎপাদনী সম্পর্ক বা স্তরের আবির্ভাব ঘটে। রস্টো-র তত্ত্বে এরূপ কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা সংঘাত নেই।

(3) মার্ক্স-এর তত্ত্বে গতির নিয়ম বা ইতিহাসের নিয়মের দ্বারা সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্ক্সের তত্ত্বকে অনেকে তাই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) বলে অভিহিত করেছেন। রস্টো-র তত্ত্বে এরূপ কোনো নিয়মের দ্বারা সমাজের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়নি।

4. রস্টো-র তত্ত্বে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন নেই। যেমন, প্রাক্-উত্তোলন পর্ব বা উত্তোলনের পূর্বশর্তের স্তর এবং উত্তোলন স্তরের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্বে প্রতিটি স্তরের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উপসংহারে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, মার্ক্সীয় তত্ত্ব রস্টো-র তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নততর। রস্টো-র আলোচনা থেকে আমরা কোনো 'তত্ত্ব' পাই না। তাঁর আলোচনা বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা মাত্র। অন্যদিকে, মার্ক্সের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছে। এখানে সমাজের এক স্তর

থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। তাই মার্ক্সের আলোচনা থেকেই আমরা সমাজের উন্নয়নের স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব পাই। আসলে রস্টোর তত্ত্বটি একান্তভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মার্ক্স অনুসৃত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা বিশ্লেষণ করা আছে এঙ্গেলস্ এবং মার্ক্স-রচিত Communist Manifesto-তে। সেই ধারণা থেকে অর্থনীতিবিদদের সরিয়ে আনাই যেন রস্টো তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর বইয়ের নাম তাই The Stages of Growth : A Non-communist Manifesto. মার্ক্সীয় তত্ত্বকে অস্বীকার করার জন্যই যেন বইটি লেখা। তাই রস্টোর বই The Stages of Growth-এর sub-title বা উপ-শিরোনাম হল : A Non-communist Manifesto. কোনো গম্ভীর বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রস্টো-র স্তর তত্ত্ব চালিত নয়।

২.৬ সারাংশ

১. মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব (Stage Theory of Marx) : মার্ক্সের মতে, কোনো অর্থনীতি পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সেগুলি হল : আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। প্রতিটি স্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্ক। উৎপাদনের শক্তিকে ঘিরে বা ধরে রাখে উৎপাদনের সম্পর্ক। উৎপাদনের শক্তি আবার উৎপাদনের সম্পর্ক অপেক্ষা বেশি গতিশীল। ফলে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ দেখা দেয়। মার্ক্স-এর মতে, এই সময়ে সমাজে বিবর্তন আসে। পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং অর্থনীতিটি আর এক উন্নততর স্তরে উন্নীত হয়। এভাবে সমাজের অগ্রগতিকে বলা হয় বিবর্তনবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

আদিম সাম্যবাদ স্তরে সব কিছু ছিল সাধারণের সম্পত্তি। উদ্বৃত্ত শ্রম বা শোষণ বলে কিছু ছিল না। কিন্তু কালক্রমে (i) শ্রমবিভাগ দেখা দিল। (ii) আদিম মানুষ কৃষিবিদ্যা ও পশুপালন আয়ত্ত করল। (iii) বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতি গড়ে উঠল ও তাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে লাগলো। বিজিতদের ধরে এনে পশুপালন ও চাষের কাজ করাতে লাগলো। এভাবে ধীরে ধীরে দাসপ্রথার উদ্ভব হল।

দাসপ্রথায় দাসেদের মালিকানা ছিল দাসমালিকদের হাতে। গৃহপালিত পশুর মতোই দাসেদের কেনাবেচা চলত। দাস মালিকরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দাসেদের সরবরাহ করত এবং উৎপন্ন দ্রব্য সবটাই আত্মসাৎ করত। ফলে দাস মালিক ও দাসদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে দাস মালিকেরা কৃষিকার্যের দিকে ঝুঁকল। উদ্ভব হল সামন্ততন্ত্রের।

সামন্ততন্ত্রে কৃষিই মূল অর্থনৈতিক কাজকর্ম। দাসেদের কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে তাদের ভূমিদাসে পরিণত করা হল। ভূমিদাসেরা চাষের জমি বা খামার ছেড়ে চলে যেতে পারতো না। ক্রমে ক্রমে ছোটো ছোটো কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগলো। শিল্পে উৎপাদনশীলতা বাড়তে লাগলো। এক সময়ে তা কৃষি

অপেক্ষা অনেক বেশি হয়ে পড়লো। ফলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ল। শিল্পে নিয়োগের জন্যই ভূমিদাসদের স্বাধীন করে দেওয়া হল। উদ্ভব হল ধনতন্ত্রের।

ধনতন্ত্রে উৎপাদনের মাধ্যমগুলির মালিকানা পুঁজিপতির। শ্রমিকের পুঁজি নেই। তাই পুঁজিপতির শর্তে তাকে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয়। সে এখন মজুরি-দাস। শ্রমিকেরা উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি পুঁজির মালিকানার জোরে তা আত্মসাৎ করে। দেখা দেয় শ্রমিক-মালিক সংঘাত। তা ছাড়া, ধনতন্ত্রে যতই মূলধন গঠন এগিয়ে চলে, মুনাফার হার কমার ঝোঁক দেখা দেয়। আবার, শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করার ফলে তারা দরিদ্র হতে থাকে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয়। এছাড়া, ধনতন্ত্রে পরিকল্পনাহীনতার ফলে কোথাও বেশি কোথাও কম উৎপাদন ঘটে। এসবের ফলে ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দেয়। মার্ক্সের মতে, এই সংকট দূর করতে হলে মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা দূর করে সামাজিক মালিকানা চাই। পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একদিন শ্রমিক শ্রেণি দখল করবে। এভাবে ধনতন্ত্রের পতন ঘটে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের মাধ্যমগুলির সামাজিক মালিকানা। ফলে শ্রমিক আর শোষিত হয় না। এভাবে মূলধনের সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে উৎপাদনের সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে। তাদের মধ্যে বিরোধ লুপ্ত হয়। সমাজতন্ত্রের শেষ লক্ষ্য হল সাম্যবাদ যেখানে মানুষের কোনো শোষণ থাকবে না। মার্ক্সের মতে, তখন রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. মার্ক্সের স্তর তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Marxian Stage Theory) : মার্ক্স দেখিয়েছেন কীভাবে সমাজ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। সংঘাত এবং তার ফলে নতুন স্তরে উত্তরণের দ্বারা সংঘাতের সাময়িক অবসান—একে বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদ। মার্ক্সের এই তত্ত্ব গতির নিয়ম এবং কিছু বস্তুগত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অনেকে তাই একে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে মনে করেন এবং একে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে।

(i) অনেকের মতে, শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয়ের দ্বারা ইতিহাসের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করা যায় না। তা ছাড়া, ইতিহাসের কোনো বস্তুমুখী নিয়ম নেই। (ii) এই তত্ত্বে বলা হয়, সমাজতন্ত্রে পৌঁছে অর্থনীতিটির কোনো সংঘাত থাকবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্রেও মানুষ-মানুষে সংঘাত থাকতে পারে। (iii) কোনো সমাজের ক্ষেত্রে সব স্তরগুলিই দেখা দেবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্রের পরেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। (iv) এই তত্ত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্ম, বিজ্ঞান, মেধা প্রভৃতি বিষয়কে অবহেলা করা হয়েছে। (v) মার্ক্স বলেছিলেন, ধনতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। বাস্তবে ধনতন্ত্রের বিলোপ ঘটেনি। বরং অনেক দেশে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে।

তবুও মার্ক্স-এর তত্ত্ব অবশ্যই গুরত্বপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণমূলক এবং নৈরাজ্যমূলক চরিত্রকে এই তত্ত্ব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছে। এটি দূর করতে হলে মূলধনের শ্রেণি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মার্ক্সই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. রস্টো-র স্তর তত্ত্ব (Rostow's Stage Theory) : রস্টো-র মতে, কোনো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি স্তর বা পর্যায় আছে। সেগুলি হ'ল—চিরাচরিত সমাজ, প্রাক্-উত্তোলন পর্ব, উত্তোলন পর্ব, সমৃদ্ধির দিকে যাত্রা এবং উচ্চ গণভোগের স্তর।

(i) চিরাচরিত সমাজ : রস্টো-র মতে, এই স্তরে সমাজে বিজ্ঞান, কলাকৌশল ও মানসিকতা হল নিউটন-পূর্ববর্তী যুগের। ফলে অব্যবহৃত সম্পদ থাকলেও বিজ্ঞান ও কলাকৌশলের অভাবের দরুন উৎপাদন বিশেষ বাড়ে না। রস্টো-র মতে, এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(i) উপকরণের বড় অংশই (75% বা তার বেশি) কৃষিতে নিযুক্ত। (ii) সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। ফলে সামাজিক চলনশীলতা ব্যাহত। (iii) রাজনৈতিক ক্ষমতা জমির মালিকানা নির্ভর। এসবের ফলে মাথাপিছু উৎপাদন খুব কম।

(ii) প্রাক্-উত্তোলন পর্ব : সমাজের অগ্রগতির এই দ্বিতীয় স্তরে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিগুলির উদ্ভব ঘটতে থাকে। ফলে স্ব-চালিত উন্নয়নের পরিস্থিতি তৈরি হয়। রস্টো-র মতে, স্ব-চালিত উন্নয়নের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। (ক) সামাজিক মূলধনের, বিশেষত পরিবহনের উন্নতি। ফলে বাজার প্রসারিত হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার হবে। (খ) কৃষির কলাকৌশলগত উন্নতি। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটবে। (গ) মূলধনি দ্রব্যসহ অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির প্রসার। রস্টোর মতে, এই স্তরে বিনিয়োগের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি।

(iii) উত্তোলন পর্ব : এই স্তরের মূলকথা হল দ্রুত বৃদ্ধি। ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া কিছুদিনের মধ্যেই স্ব-চালিত হয়ে ওঠে। উত্তোলন পর্বের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল : (ক) নিট বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের 10% বা তার বেশি করা। (খ) উন্নয়নের উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। (গ) এক বা একাধিক নেতৃস্থানীয় ক্ষেত্রের বিকাশ। এগুলি উন্নয়নের মেরুদণ্ড। রস্টো তিন ধরনের নেতৃস্থানীয় শিল্পের উল্লেখ করেছেন : (a) প্রাথমিক উন্নয়ন ক্ষেত্র, (b) সহায়ক বা অনুপূরক উন্নয়ন ক্ষেত্র এবং (c) উদ্ভূত উন্নয়ন ক্ষেত্র। রস্টোর মতে, নেতৃস্থানীয় শিল্পের উন্নতির জন্য চারটি বিষয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন : (ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তীর্ণ বাজার, (খ) নতুন উৎপাদন কৌশল, (গ) প্রাথমিক মূলধন এবং (ঘ) অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী পরিপূরক শিল্প। রস্টো তাঁর বইয়ে কয়েকটি দেশের উত্তোলন পর্ব কালও উল্লেখ করেছেন।

(iv) সমৃদ্ধির দিকে যাত্রা : এই স্তর হল স্বয়ংচালিত দীর্ঘকালীন উন্নয়নের স্তর। চার বা বেশি দশক ধরে এরূপ উন্নয়ন চলতে থাকে। নতুন নেতৃস্থানীয় শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। রস্টো-র মতে, এই স্তরে অর্থনীতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে—(ক) শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়ে। (খ) দক্ষ পরিচালক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। (গ) জনগণ কৃৎকৌশলের আরো উন্নতি চায়। এছাড়া, এই স্তরে (ঘ) শ্রমিকের অ-কৃষিক্ষেত্রে স্থানান্তর ঘটে। (ঙ) অ-কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকের মেধাভিত্তিক কাজকর্মে স্থানান্তর ঘটে।

(v) উচ্চ গণভোগের স্তর : এই স্তরে সমাজের মনোযোগ যায় জোগান থেকে চাহিদার দিকে, উৎপাদন থেকে ভোগ ও কল্যাণের দিকে। জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়—(ক) কল্যাণব্রতী সরকার প্রতিষ্ঠা, (খ) প্রগতিশীল করের দ্বারা আয়ের সুষম বণ্টন ঘটানো, (গ) উপযুক্ত সরকারি নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানো। রস্টো-র মতে, এরূপ স্তরের সমাজের আদর্শ উদাহরণ হল 1920 সালের পর আমেরিকার অর্থনীতি এবং 1950 সালের পর পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতি।

৪. রস্টো-র স্তর তত্ত্বের মূল্যায়ন (An Evaluation of Stage Theory of Rostow) : রস্টো তত্ত্বের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ করা হয়। (ক) এই তত্ত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে ফেলা হয়েছে। বাস্তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বড় বিচিত্র; দেশে দেশে এর গতিপথ ভিন্ন। (খ) এক স্তর থেকে অন্য স্তরে কীভাবে উত্তরণ ঘটে, তা এই তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়নি। (গ) রস্টো তত্ত্বে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। যেমন, প্রাক্-উত্তোলন পর্ব এবং উত্তোলন পর্বের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়।

রস্টোর আগে প্রণীত মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে কীভাবে অর্থনীতির উত্তরণ ঘটে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক। কিন্তু রস্টো শুধু বিভিন্ন স্তরের কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাই তার তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা যায় না।

৫. রস্টো বনাম মার্ক্স : স্তর তত্ত্বের তুলনা (Rostow Versus Marx : A Comparison of Two Stage Theories) : রস্টো ও মার্ক্সের স্তর তত্ত্বের প্রধান পার্থক্যগুলি হল : (ক) মার্ক্স-এর তত্ত্বে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বারা সমাজের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রস্টো-র তত্ত্বে এরূপ কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। (খ) মার্ক্স-এর তত্ত্বে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে সংঘাতের ফলে অর্থনীতি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। রস্টো-র তত্ত্বে এরূপ কোনো সংঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই। (গ) মার্ক্স-এর তত্ত্বে গতির নিয়ম বা ইতিহাসের নিয়মের দ্বারা সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু রস্টো-র তত্ত্বে বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মাত্র। (খ) রস্টো-র তত্ত্বে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন নেই। কিন্তু মার্ক্স-এর তত্ত্বে প্রতিটি স্তরের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে।

এক কথায়, মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক, কিন্তু রস্টো-র তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক নয়।

২.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. স্তর তত্ত্ব কাকে বলে?

২. রস্টো-র স্তর তত্ত্বে পাঁচটি স্তরের নাম কী?

৩. কার্ল মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বের পাঁচটি স্তরের নাম বলুন।

৪. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কাকে বলে?

৫. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে কী বোঝেন?

৬. স্তরক্রম সম্পর্কে রস্টো-র বইয়ের নাম কী?

৭. ধনতন্ত্র কাকে বলে?

৮. মার্ক্স ধনতন্ত্রে শ্রমিকদের মজুরি-দাস বলেছেন কেন?

৯. ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

১০. সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

১১. মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে সমাজতন্ত্রের শেষ লক্ষ্য কী?

১২. মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলা হয় কেন?

১৩. গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে কোন্ শিল্প নেতৃস্থানীয় ক্ষেত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে?

১৪. রস্টো বর্ণিত প্রাক্-উত্তোলন পর্বের দুটি বৈশিষ্ট্য বলুন।

১৫. রস্টো-র উত্তোলন পর্বের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

১৬. রস্টো উল্লিখিত উচ্চ গণভোগের স্তরের দুটি বৈশিষ্ট্য বলুন।

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. কার্ল মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি ছোট্ট টীকা লিখুন।

২. মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের ধারণার গুরুত্ব গুছিয়ে বলুন।

৩. রস্টো-র স্তর তত্ত্বের উত্তোলন পর্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৪. রস্টোর তত্ত্বের উচ্চ গণভোগের স্তরটি আলোচনা করুন।

৫. মার্ক্সের স্তর তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

৬. রস্টো-র স্তর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭. রস্টো-র স্তর তত্ত্ব এবং মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ১০ নম্বরের :

১. মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. রস্টো-র স্তর তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৩. রস্টো-র স্তর তত্ত্ব এবং মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

৪. মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. Sarkhel, Jaydeb, Seikh Salim & Anindya Bhukta (2017) : Economic Development : Institutions, Theory and Policy, Book Syndicate (P) Ltd.

২. Bhattacharyya, H. (1990) : Economics of Underdevelopment, Calcutta Book House (P) Ltd.

৩. ভট্টাচার্য, কল্যাণব্রত (2000) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : তত্ত্ব ও তথ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৪. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্ত (2020) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

একক ৩ ❑ উত্তরণ বিতর্ক

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ : মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা

৩.৪ ডব-সুইজি বিতর্ক

৩.৫ কয়েকটি মন্তব্য

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ❖ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা
- ❖ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে ডব-সুইজি বিতর্ক

৩.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় অনেক অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন। এই ধারণাগুলিকে একযোগে উন্নয়ন সম্পর্কিত স্তর তত্ত্ব (stage theory) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। উন্নয়নের যে তত্ত্ব কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে কয়েকটি পর্যায় বা স্তরে ভাগ করে আলোচনা করে তাকে উন্নয়নের স্তর তত্ত্ব বলে। আমরা পূর্বের এককে (একক ২) এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। উন্নয়ন তত্ত্বে উল্লেখযোগ্য স্তর তত্ত্বের আলোচকগণ হলেন যথাক্রমে উইলিয়াম পেটি (1690), অ্যাডাম স্মিথ (1776), ফ্রেডেরিখ লিস্ট (1841), কার্ল মার্ক্স (1848), কলিন ক্লার্ক (1957) এবং ওয়াল্ট হুয়িটম্যান রস্টো (1960)। এঁদের তত্ত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্ব এবং রস্টোর স্তর তত্ত্ব। এই দুইটি স্তর তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা ২-নং এককে আলোচনা করেছি। বর্তমান এককে আমরা মার্ক্স-এর স্তর তত্ত্বের একটি বিশেষ তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে, মার্ক্সের মতে কোনো একটি দেশের অর্থনীতি পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। সেই পাঁচটি স্তর হল যথাক্রমে আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। কীভাবে কোনো একটি অর্থনীতি একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছায় সেটি মার্ক্স একটি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই তত্ত্বটির নাম হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History)। এর মাধ্যমেই দেশটির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে। এই তত্ত্বের দ্বারাই মার্ক্স ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে একটি দেশের সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে। মার্ক্স-এর এই বিশ্লেষণ কেউ কেউ মেনে নিয়েছেন, কেউ কেউ নানা প্রশ্ন তুলেছেন, আবার কেউ কেউ এই ব্যাখ্যার কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন নির্দেশ করেছেন। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক হল ডব-সুইজি বিতর্ক (Dobb-Sweezy Controversy)। আমরা প্রথমে এই উত্তরণ সম্পর্কে মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। তারপর ডব-সুইজি বিতর্ক এবং এই বিতর্কের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গিও বর্ণনা করা হবে।

৩.৩ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ : মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা

মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব দ্বারা মার্ক্স ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে কোনো অর্থনীতির একটা স্তর থেকে অপর স্তরে উত্তরণ ঘটে। একে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও বলা হয়। এই তত্ত্বের মূলকথা হ'ল, কোনো দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি বা বিকাশ নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থার (modes of production) পরিবর্তনের উপর। এই উৎপাদন ব্যবস্থা দুটি বিষয় নিয়ে গঠিত : উৎপাদনী শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদনী সম্পর্ক (relations of production)। উৎপাদনের কাজে যে সমস্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেই সম্পর্ককেই বলা হয় উৎপাদনী সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ব্যক্তি নিরপেক্ষ। উৎপাদনের সামাজিক প্রয়োজনে ইহা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে, মানুষের সাথে উৎপাদনের উপকরণের সম্পর্ককে বলা হয় উৎপাদনী শক্তি। উৎপাদন সম্পর্ক কেমন হবে সেটি এই উৎপাদনী শক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত উৎপাদনী শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, উৎপাদনী সম্পর্ক মানুষের সাথে তার উৎপাদনী উপকরণের সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল এবং মূলত তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

মার্ক্সের মতে, উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার (dialectics) মাধ্যমেই কোনো অর্থনীতির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ (transition) ঘটে। এই দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াটি নিম্নলিখিত তিনটি সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(১) আমরা বলেছি যে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে উৎপাদনী সম্পর্ক। সুতরাং উৎপাদনী শক্তি হল মূল বস্তু (content) এবং উৎপাদনী সম্পর্ক হল তার বাইরের আকার (form)। এই

উৎপাদনী সম্পর্কের মাধ্যমেই উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ঘটে। উভয়ের যৌথ বা যুগ্ম (combined) অবস্থাকে বলা হল উৎপাদনী ব্যবস্থা বা উৎপাদনী পদ্ধতি (modes of production)। এরা কোনো সমাজব্যবস্থায় একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—এরা পৃথকভাবে বিরাজ করতে পারে না।

(২) সমাজের প্রয়োজনে মানুষ তার মেধা ও শ্রম শক্তির ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ঘটায়। এর ফলে উৎপাদনী শক্তি দ্রুতহারে বিকাশ লাভ করে।

(৩) উৎপাদনী শক্তি দ্রুত বিকশিত হলেও উৎপাদনী সম্পর্ক দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারে না। ফলে নতুন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্কের বিরোধ দেখা দেয়। ফলে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই গতিশীল (dynamic) উৎপাদনী শক্তির চাপে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ক তখন ভেঙে যায়। ফলে নতুন উৎপাদনী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে যখন উৎপাদনী সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হয়, তখন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের পুনরায় সামঞ্জস্য ঘটে। উৎপাদনী শক্তি পুনরায় দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে আবার তাদের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে। তখন আবার নতুন বিকশিত উৎপাদনী শক্তির চাপে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। মার্ক্সের মতে, এভাবে উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজের অগ্রগতি ঘটে। যখন উৎপাদনের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, তখনই সমাজ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। একেই মার্ক্সের তত্ত্বে দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (dialectics বা dialectical materialism) বলা হয়। এটিই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা।

এখন, এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে কীভাবে মার্ক্স-এর তত্ত্বে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে কোনো দেশের উত্তরণ ঘটে তা দেখা যাক।

সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভূমিদাসদের (serfs) সাহায্যে কৃষিকার্য। এই সমাজব্যবস্থা অনেকটা পিরামিডের মতো। সবচেয়ে উপরে থাকতো মহারাজা, তার নিজে রাজা, তার নিজে সামন্তপ্রভু বা জমিদার। আর প্রতিটি জমিদারের নীচে বা অধীনে বহু সংখ্যক ভূমিদাস। এই ভূমিদাসেরা ঠিক কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যেমন ছিল দাসপ্রথায় দাসেরা। তবে এই ভূমিদাসেরা সামন্তপ্রভুর জমিতে কিছুদিন বিনা মজুরিতে শ্রম দিতে বাধ্য থাকতো। বিনিময়ে এদের কিছু পরিমাণ জমি চাষ করতে দেওয়া হত। এরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এরা গ্রাম ছেড়ে যেতে পারতো না। ভূমিদাসরা উদ্বৃত্ত ফসল জমিদারদের অর্পণ করত। জমিদারেরা সেই উদ্বৃত্তের একটা অংশ রাজাকে প্রদান করতো। রাজা আবার তার একটা অংশ মহারাজাকে প্রদান করতো।

এই সামন্ততন্ত্র ছিল দাসপ্রথা অপেক্ষা উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা। এই সামন্তযুগের প্রথমদিকে উৎপাদনশক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। মানুষ জলশক্তি ও বায়ুশক্তিকে ব্যবহার করতে শেখে। নদীর ধারে গম পেষাই কল এবং নদীতে পালতোলা নৌকা ও জাহাজের ব্যবহার বাড়তে থাকে। মানুষ ধীরে ধীরে লোহার

ব্যবহার শিখতে আরম্ভ করে। কাগজ কল, বারুদ কারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে। ক্ষুদ্র ও হস্তচালিত শিল্পেরও দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। কৃষিবিজ্ঞানেরও উন্নতি ঘটে। নতুন নতুন দানাশস্য, ফল ও সবজির চাষ শুরু হয়। পশুপালন প্রসার লাভ করে। এভাবে সামন্ততন্ত্রে উৎপাদনী শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। জলপথের আবিষ্কার হওয়ার ফলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারে পণ্য বিক্রয় সম্ভব হয়। এছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও দেশীয় ও বৈদেশিক বাজার প্রসার লাভ করে। বাজারের এই বর্ধিত চাহিদা মেটাবার জন্য যান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদন শুরু হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পাশাপাশি কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়। সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে অনেক শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন চালু হয়। এভাবে দেখা দেয় শ্রম বিভাগ। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে এবং বিনিয়োগের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

কারখানা প্রথায় উৎপাদন শুরু হবার ফলে সামন্ততন্ত্রে উৎপাদনী সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। সামন্ততন্ত্রে প্রকৃত কৃষক এবং মহারাজার মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি ছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। এটাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার শোষণমূলক দিক এবং ভূমিদাস ও ভূস্বামীদের মধ্যে সম্পর্কটি ছিল বৈর (antagonistic) সম্পর্ক। আবার, সামন্তপ্রভুরা ভূমিদাসদের ভূমির সাথে সংলগ্ন রাখতে চায়। এদিকে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফলে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই কারখানাভিত্তিক উৎপাদনের জন্য চাই স্বাধীন মজুর। এভাবে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই বিকশিত উৎপাদনী শক্তির বিরোধ দেখা দেয়। কারখানায় কাজ করার জন্য স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাসেরা জমিতে আবদ্ধ থাকার ফলে তারা কারখানায় কাজ করতে এগিয়ে আসতে পারে না। তখনই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের এই হল মার্ক্স-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা উৎপাদনী সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির বিরোধের মাধ্যমেই এই উত্তরণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩.৪ ডব-সুইজি বিতর্ক

কোনো অর্থনীতির সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি সম্পর্কে মরিস ডব এবং পল সুইজি-র মধ্যে মতভেদ আছে। এটি উন্নয়নের স্তর তত্ত্বে ডব-সুইজি বিতর্ক নামে পরিচিত। তাঁদের মত-পার্থক্য আসলে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যের ধারণার মধ্যে নিহিত। ডব-এর মতে, সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই ব্যবস্থায় ভূমিদাসের (serf labour) উপস্থিতি আর ধনতন্ত্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল মজুরি-শ্রমের (wage labour) বা মজুরিভিত্তিক শ্রমিকের উপস্থিতি। তিনি এই দুই প্রকার শ্রমিকের অস্তিত্বের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই দুই ব্যবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাসেরা

শোষিত হয় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার ফলে। এই ব্যবস্থায় ভূমিদাসেরা দাসপ্রথার ন্যায় পুরোপুরি অন্যের সম্পত্তি ছিল না বটে, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তারা গ্রাম ত্যাগ করে যেতে পারতো না। সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময় তাদের সামন্তপ্রভুদের জমিতে চাষ করতে হত। প্রকৃত কৃষক এবং সর্বোচ্চ সামন্তপ্রভুর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তাদের মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি ছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। আমরা জানি, এটাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার শোষণমূলক দিক। ডব-এর মতে, এই শোষণের পিছনে শক্তি হল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা (direct politico-legal compulsion)। অন্যদিকে, সুইজি সামন্ততন্ত্রকে বর্ণনা করেছেন পরিবারের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে এবং ধনতন্ত্রকে বর্ণনা করেছেন বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে। কিন্তু সুইজি-র এই বর্ণনা প্রধানত দুটি কারণে মানা যায় না। প্রথমত, সামন্ততন্ত্রকে পরিবারের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করলে মনে হবে যে, সামন্ততন্ত্রে কোনো উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। কিন্তু একথা ঠিক নয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট উদ্বৃত্ত কলকারখানা তৈরিতে কাজে লেগেছে। ধনতন্ত্র বিকাশের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত, সুইজি কেবলমাত্র ধনতন্ত্রকে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবর্তন ক্রমশ দেখা দেয় এবং যে সমস্ত বিষয়ের প্রভাবে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ে সেগুলি হল—উৎপাদনের ক্ষেত্রে বায়ুশক্তি ও জলশক্তির ব্যবহার, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বাজারের প্রসার, বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার, বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি। সুতরাং ধনতন্ত্রই শুধুমাত্র বিনিময়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, একথা ঠিক নয়।

মার্ক্স পুঁজিবাদী রূপান্তরের (transition) দুটি পথের কথা বলেছেন। প্রথম পথটিতে উৎপাদক পরিণত হয় ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিতে। মার্ক্স-এর মতে, এই প্রথম পথটি হল প্রকৃতই বৈপ্লবিক পদ্ধতি বা পথ (really revolutionary way)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি বা পথটিতে মার্চেন্ট বা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে শিল্পপতি এবং সে প্রাণপণে চেষ্টা করে পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই শিল্পের কাজকর্মকে আবদ্ধ রাখতে। প্রথম পথটিতে উৎপাদক শ্রেণির মধ্য থেকেই পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। কিছু সংখ্যক উৎপাদক যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ বা চয়ন করে (accumulate) এবং তারপর তারা উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে তারা ব্যবসায়ীর কাজও শুরু করে। এটিকেই প্রকৃত বৈপ্লবিক পথ বা প্রত্যক্ষ পথ (direct way) বা পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ধনতন্ত্র উদ্ভবের পরোক্ষ পথটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের কিছুই অবদান নেই। তারা কারিগরদের কাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে নিয়ে যায়। এই কাজের মাধ্যমে তারা কিছু মূলধন সংগ্রহ করে উৎপাদন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। ব্যবসায়ীদের নির্দেশ ক্রমে উৎপাদকদের একই ছাদের তলায় নিয়ে আসে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি উৎপাদক শ্রেণির মধ্য থেকেই পুঁজিবাদী শ্রেণি উঠে আসে তাহলে সেটি হল প্রকৃত বৈপ্লবিক পথ বা প্রত্যক্ষ পথ। অন্যদিকে, যখন ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, ঐটিকে পরোক্ষ পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকেই উঠে আসে প্রথম পদ্ধতি, আর উৎপাদন ব্যবস্থার উপর থেকে এসেছে দ্বিতীয় পদ্ধতি। ডব পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে, প্রথম বা প্রত্যক্ষ পথ ধরেই ধনতন্ত্র এসেছে। অন্যদিকে, জাপান এবং প্রাশিয়ায় ধনতন্ত্র এসেছে দ্বিতীয় (পরোক্ষ) পথে।

ধনতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে সুইজি যে বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি হল বিনিময় ব্যবস্থা বা বিনিময় সম্পর্ক। তিনি মনে করেন, সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ধাণকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিনিময়। তাঁর মতে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারই হল সামন্ততন্ত্র ভেঙে যাওয়ার পিছনে প্রধান কারণ। সেই অনুযায়ী, সুইজি-র আলোচনায় বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে হলে বাণিজ্য মূলধন এবং শিল্প মূলধনের মধ্যে পার্থক্য করা এবং এই দুই প্রকার মূলধনের ভূমিকা বিচার করা প্রয়োজন। কিন্তু সুইজি এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেননি।

সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের যে দুটি পথ মার্ক্স উল্লেখ করেছেন, সুইজি তার তাৎপর্য বা মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ঐ দুই পথের অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যবসায়ী থেকে উৎপাদকে পরিণত হওয়ার পথ আসলে গ্রেট বৃটেনের বিক্ষিপ্ত বা বিকীর্ণ ব্যবস্থা (putting out system)। এই ব্যবস্থায় পশম বস্ত্র ব্যবসায়ীরা পশম উৎপাদকদের কাছ থেকে পশম কিনত এবং সেই কাঁচামাল তারা পশমবস্ত্র উৎপাদনকারীদের নিকট পৌঁছে দিত। উৎপাদক-কারিগররা পশমবস্ত্র তৈরি করলে সেই বস্ত্র ঐ ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে বাজারে নিয়ে যেত। গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের প্রথম দিকে এরূপ গৃহভিত্তিক কারখানা উৎপাদন শুরু হয়। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা একে Putting out system বা বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের যে দ্বিতীয় বা পরোক্ষ পথের কথা মার্ক্স বলেছেন, সুইজি দ্বিতীয় পথ বলতে Putting out system-কেই মনে করেছেন যা ব্যবসায়ীদের কালক্রমে পুঁজিপতিতে পরিণত করে। আর প্রথম পথের ক্ষেত্রে, উৎপাদক অবতীর্ণ হয় ব্যবসায়ী এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগ কর্তা উভয় রূপেই। কিন্তু সুইজি এই প্রথম পথটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম রাস্তার ব্যাখ্যায় এই ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কালক্রমে শিল্প-পুঁজিবাদীতে রূপান্তরিত হওয়া তাঁর কাছে তেমন গুরুত্বের ছিল না। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উৎপাদকেরা রাষ্ট্রের সহায়তায় বা পৃষ্ঠপোষকতায় যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল সেটিই ধনতন্ত্রের উন্মেষের মার্ক্স-কথিত প্রথম পথ।

ডব সঠিকভাবেই এই সত্যের উপর জোর দিয়েছেন যে, এই ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই

ধনতন্ত্রের উন্মেষ। গ্রেট ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের উন্নয়নের ইতিহাস থেকে তার সাক্ষ্য মেলে।

তাকাহাসি ডবের বক্তব্যের সমর্থনে বলেছেন যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজিপতিরাই বড় আকারের বাণিজ্য মূলধনের স্বাধীন কাজকর্মে সহায়তা করে এবং পুঁজিবাদী শিল্পায়নের সূচনা ঘটায়।

৩.৫ কয়েকটি মন্তব্য

মার্ক্স-এর তত্ত্বে কোনো অর্থনীতির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। আমরা এই উত্তরণ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'একটি মন্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি।

১. মার্ক্স বলেছেন যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কার্যকারিতার জন্য কোনো সমাজ এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, উৎপাদনী সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির বিরোধের ফলে বা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় পুরনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা জন্ম নেয়। মার্ক্সের মতে, এভাবেই আদিম সাম্যবাদ থেকে দাস ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আপনা আপনিই ঘটবে না বলে মার্ক্স সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণিকে সশস্ত্র এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধনতন্ত্রে উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদনী সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং শ্রমিকের শোষণের ফলে এই ব্যবস্থা আপনা-আপনিই ভেঙে পড়বে, একথা মার্ক্স তাঁর স্তর তত্ত্বে বলেননি। বরং শ্রমিক শ্রেণি দ্বারা সচেতনভাবে নেতৃত্ব দিয়ে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন।

২. মার্ক্সের স্তর তত্ত্বে আমরা পাঁচটি স্তর পাই। সেই স্তর ক্রমটি হল : আদিম সাম্যবাদ, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, মার্ক্স একথা কোথাও বলেননি যে, পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজই উল্লিখিত প্রতিটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করবে। বরং এই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে যে, একটি স্তর থেকে সমাজ বিকাশের ধারা যাত্রা শুরু করে তার ঠিক পরের স্তরকে উপেক্ষা করেও সেটি উন্নত পরবর্তী স্তরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের (1917) পূর্বে রাশিয়া জারতন্ত্রের অধীনে ছিল অর্থাৎ সেখানে ছিল সামন্ততন্ত্র। লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের স্তর বাদ দিয়ে সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটেছিল।

৩.৬ সারাংশ

১. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ : মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা (Transition from Feudalism to Capitalism : Explanation of Marx) : মার্ক্সের মতে, উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের ফলে কোনো সমাজ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। সামন্ততন্ত্রেও এই দুই বিষয়ের বিরোধ কাজ করে। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ যে হারে ঘটে, উৎপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তন সেই হারে ঘটে না। ফলে বিকশিত উৎপাদনী শক্তির চাপে পুরনো সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে যায়। দেশটির এক স্তর থেকে অপর স্তরে উত্তরণ ঘটে। সামন্ততন্ত্রেও উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ে এবং ধনতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের এটিই হল সংক্ষেপে মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা।

২. ডব-সুইজি বিতর্ক (Dobb-Sweezy Controversy) : কোনো সমাজের সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি নিয়ে মরিস ডব এবং পল সুইজি-র মধ্যে মতভেদ আছে। এটি ডব-সুইজি বিতর্ক নামে পরিচিত। তাঁদের এই মতপার্থক্যের উৎস হল সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মৌল চরিত্র সম্পর্কে ধারণার পার্থক্য। ডব-এর মতে, সামন্ততন্ত্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল ভূমিদাস প্রথা, আর ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মজুরিভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থা। অন্যদিকে, সুইজি সামন্ততন্ত্রকে বর্ণনা করেছেন পরিবারের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে এবং ধনতন্ত্রকে বর্ণনা করেছেন বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে। তাই সুইজির মতে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের চাপেই সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়েছে এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে, ডব মনে করেন, ছোট ছোট উৎপাদকরাই ক্রমে ক্রমে বড় পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে এবং পুঁজিবাদের পত্তন ঘটিয়েছে।

৩.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. উন্নয়নের স্তর তত্ত্ব কাকে বলে?
২. কয়েকজন স্তর তত্ত্ব প্রবর্তকের নাম বলুন।
৩. স্তর তত্ত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে পুরনো আলোচক কে?
৪. মার্ক্স কোন্ তত্ত্বের দ্বারা কোনো সমাজের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেছেন?
৫. ডব-সুইজির বিতর্কের বিষয়বস্তু কী?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে কী বোঝেন?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. কোনো সমাজের সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।

২. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি সম্পর্কে ডব-সুইজি বিতর্কটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Sarkhel, Jaydeb (1997) : An Introduction to Marxian Economics, Book Syndicate Private Limited.

2. Bhattacharyya, Harasankar (1990) : Economics of Underdevelopment, Calcutta Book House (P) Limited.

3. Raychaudhuri, Bibekananda (1995) : Some Aspects of the Transition from Feudalism to Capitalism, Artha Beekshan, Vol 4. No. 1, June.

4. ভট্টাচার্য, হরশঙ্কর ও গণপতি মজুমদার (1982) : উন্নয়নের অর্থনীতি, ক্যালকাটা বুক হাউস।

একক ৪ ❑ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে রিকার্ডো-র (ক্লাসিক্যাল) তত্ত্ব

৪.৪ ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে মার্ক্স-এর তত্ত্ব

৪.৪.১ মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতাজনিত সংকট

৪.৪.২ অসমানুপাতজনিত সংকট

৪.৪.৩ ভোগঘাটতিজনিত সংকট

৪.৫ ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

৪.৬ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরের অভিজ্ঞতা

৪.৬.১ সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা

৪.৬.২ সমাজতান্ত্রিক চিনের অভিজ্ঞতা

৪.৭ সারাংশ

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন সংকট ঘনীভূত হয়?
- ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে মার্ক্স-এর তত্ত্ব
- ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
- সমাজতান্ত্রিক চিনে এবং ভূতপূর্ব সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পরের অভিজ্ঞতা।

৪.২ প্রস্তাবনা

আমরা জানি, যে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, ভোগকারী এবং বিনিয়োগকারীর সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে এবং দাস ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সংক্ষেপে ধনতন্ত্র বলে। মার্ক্স এবং রিকার্ডো আলাদা আলাদা ভাবে এই ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মার্ক্সের মতে, কোনো একটি অর্থনীতি উন্নয়নের সময় পাঁচটি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই পাঁচটি স্তর হল : আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। সুতরাং মার্ক্সের তত্ত্বে ধনতন্ত্র হল কোনো সমাজ বা অর্থনীতির বিকাশের চতুর্থ স্তর। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাজার ব্যবস্থাও (market system) বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে এবং আমেরিকায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। তুলা বস্ত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগের প্রচলন ও প্রসার ঘটে। দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিক মাত্রায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে হয়। তার ফলে কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের পরিবর্তে কারখানা প্রথার উদ্ভব হয়। এভাবে গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্রের সাহায্যে কারখানায় বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন। গ্রেট ব্রিটেনের পর এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো একটি মডেলের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে একটি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নিশ্চল অবস্থায় (stationary state) পৌঁছায়। দ্বিতীয় এককে আমরা এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। সেখানে রিকার্ডোর মডেলের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান এককে আমরা রিকার্ডোর মডেলটি বিশদে আলোচনা করবো। আবার, অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্স ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্পর্কেও আমরা দ্বিতীয় এককে আলোচনা করেছি। মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের নিজস্ব নানা অভ্যন্তরীণ বিরোধের জন্য এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। এভাবে মার্ক্স এবং রিকার্ডো উভয়েই আলাদা আলাদাভাবে ধনতন্ত্রের সংকটের কথা বলেছেন। বর্তমান এককে আমরা ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা রিকার্ডোর তত্ত্ব আলোচনা করব। তারপর ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে মার্ক্সের তত্ত্ব আলোচনা করা হবে। মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের নানা সংকটের ফলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটবে এবং দেশটির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে। এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরের অবস্থা নিয়েও বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে।

৪.৩ ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে রিকার্ডোর (ক্লাসিক্যাল) তত্ত্ব

রিকার্ডো তাঁর উন্নয়ন মডেলে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি দেশ নিশ্চল অবস্থায় (stationary state) পৌঁছায়। রিকার্ডোর মতে, এর পিছনে কাজ করে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম, জমিদার শ্রেণির অনুৎপাদক ভোগ এবং জনসংখ্যার চাপ। এই মডেলে কয়েকটি অনুমান করা হয়।

১. একটিমাত্র দ্রব্য (শস্য) উৎপন্ন হচ্ছে।

২. মোট জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট।

৩. উৎপাদনের উপকরণ ৩টি : জমি, শ্রম ও মূলধন। শ্রম ও মূলধন সর্বদাই ১ : ১ অনুপাতে নিযুক্ত হচ্ছে। সুতরাং এই মডেলে জমি স্থির উপাদান এবং মূলধনসহ শ্রম হল পরিবর্তনীয় উপাদান। সমাজে তিনটি শ্রেণি রয়েছে : জমির মালিক বা জমিদার, মূলধনের মালিক বা পুঁজিপতি এবং শ্রমের মালিক বা শ্রমিক।

৪. নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে বেশি বেশি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হবে। সেক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় উৎপাদন (AP) ও প্রান্তিক উৎপাদন (MP) ক্রমাগত কমবে।

৫. মজুরির হার জীবনধারণের স্তরে (subsistence level) নির্দিষ্ট রয়েছে। এর পিছনে কাজ করছে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব। মজুরির হার যদি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় স্তরের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী, জনসংখ্যা বাড়বে, শ্রমের জোগান বাড়বে এবং মজুরি হার পুনরায় জীবনধারণের স্তরে নেমে আসবে। আবার, মজুরির হার যদি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় হারের চেয়ে কম হয়, তাহলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। ফলে জনসংখ্যা কমবে, শ্রমের জোগান কমবে। ফলে মজুরি বাড়বে এবং পুনরায় তা জীবনধারণের স্তরে উঠে যাবে। সুতরাং দীর্ঘকালে মজুরির হার হবে জীবনধারণের স্তরের সমান। অনেকে একে মজুরির লৌহ নিয়ম (Iron law of wages) বলে অভিহিত করেছেন।

৬. উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রে দুটি নীতি ধরা হচ্ছে। একটি হল প্রান্তিক নীতি এবং অপরটি হল উদ্বৃত্ত নীতি। প্রান্তিক নীতিটির বক্তব্য হল, পরিবর্তনীয় উপাদান তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। উদ্বৃত্ত নীতিটির বক্তব্য হল, পরিবর্তনীয় উপাদানের পাওনা মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা স্থির উপাদানের মালিক অর্থাৎ এক্ষেত্রে জমিদার পাবে।

৭. কোনো স্থির মূলধন নেই। সবটাই শস্যের আকারে পরিবর্তনীয় মূলধন।

৮. মুনাফা হল মূলধন গঠনের উৎস।

এই অনুমানগুলির সাহায্যে আমরা দেখব কীভাবে একটি দেশ নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছায়। ৪.১ নং চিত্রে আমরা এটা বর্ণনা করেছি। চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আমরা মূলধন ও শ্রমের যৌথ পরিমাণ (composite dose) পরিমাপ করছি এবং উল্লম্ব অক্ষে মূলধনসহ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (MP) ও গড়

উৎপাদন (AP) এবং মজুরির হার পরিমাপ করছি। চিত্রে আমরা পরিবর্তনীয় উপাদানের AP ও MP রেখা টেনেছি। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন এই রেখা দুটি নিম্নমুখী হয়েছে। মজুরির হার OW স্তরে নির্দিষ্ট। সুতরাং, মজুরি রেখাটি একটি অনুভূমিক সরলরেখা হয়েছে। এখন, মনে করি, শ্রম ও মূলধনের প্রাথমিক নিয়োগের পরিমাণ হল OL_1। তখন মোট উৎপাদন = $OL_1 \times BL_1 = \square OABL_1$। এই মোট উৎপাদন জমিদার, পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের মধ্যে বণ্টিত হবে। শ্রম ও মূলধন প্রতিদান পাবে তাদের প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী। তাদের মোট প্রতিদান = $CL_1 \times OL_1 = \square ODCL_1$। অতএব $\square$ ABCD হল উদ্বৃত্ত। এটা জমির মালিক অর্থাৎ জমিদার পাবে। সুতরাং, $\square$ ABCD হল জমিদারের খাজনা। এখন, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরির হার = OW। তাহলে মোট মজুরি = $OW \times OL_1 = \square OWFL_1$। পরিবর্তনীয় উপাদানের মোট প্রতিদান থেকে মোট মজুরি বাদ দিলে পুঁজিপতির মুনাফা পাওয়া যাবে। সুতরাং, পুঁজিপতির মুনাফা = $\square ODCL_1 - \square OWFL_1 = \square CDWF$। পুঁজিপতিরা এই মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করবে। ফলে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়বে। দেশটি L_1 থেকে ক্রমাগত ডানদিকে সরে যাবে। যত ডানদিকে দেশটি সরবে, মোট উৎপাদনে খাজনায় অংশ বাড়বে এবং মুনাফার অংশ কমবে। এভাবে দেশটি এক সময় S বিন্দুতে পৌঁছাবে যেখানে মোট মুনাফা শূন্য এবং মোট উৎপাদন = মোট খাজনা + মোট মজুরি। S বিন্দুতে মোট উৎপাদন = $\square OA_1B_1L_0 + \square OWSL_0$ অর্থাৎ মোট উৎপাদন = মোট খাজনা + মোট মজুরি। এক্ষেত্রে মোট মুনাফা শূন্য এবং মুনাফার হারও শূন্য। মোট মুনাফা শূন্য বলে আর বিনিয়োগ হবে না। ফলে মূলধন গঠন হবে না। তখন শ্রম নিয়োগ বাড়বে না। ফলে উৎপাদন বাড়বে না। একেই রিকার্ডো নিশ্চল অবস্থা (Stationary state) বলেছেন। দেখা যাচ্ছে, মূলধন গঠনের সাথে সাথে পরিবর্তনীয় উপাদানের MP কমছে এবং একই সাথে মুনাফার হারও কমছে।

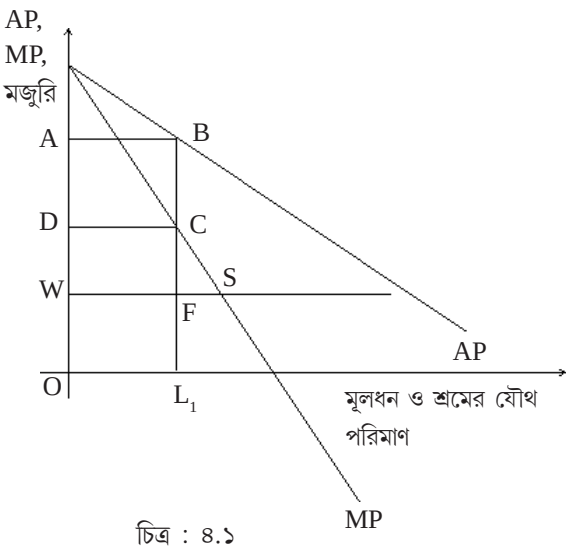

চিত্র : ৪.১

এটি সহজেই দেখানো যায়। রিকার্ডোর মডেলে কোনো স্থির মূলধন নেই, সবটাই পরিবর্তনীয় মূলধন বা মোট মজুরি। সুতরাং রিকার্ডোর মডেলে মোট মূলধন = মোট মজুরি। এখন, মুনাফার হার

$$= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{মোট মূলধন}} = \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{মোট মজুরি}} = \frac{\square CDWF}{\square OWFL_1}$$

$$=\frac{CF\times OL_1}{FL_1\times OL_1}=\frac{CF}{FL_1}=\frac{CL_1-FL_1}{FL_1}=\frac{CL_1}{FL_1}-1=\frac{MP}{w}-1$$

$$\text{অর্থাৎ মুনাফার হার} = \frac{\text{পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{মজুরির হার}} - 1$$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মুনাফার হারের সঙ্গে MP-র প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং মজুরির হারের সঙ্গে বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের জন্য MP কমছে। ফলে মুনাফার হারও কমছে।

S বিন্দুতে MP = w অর্থাৎ $\frac{MP}{w}=1$ এবং তাই মুনাফার হার = 1 – 1 = 0। S বিন্দু হল রিকার্ডোর মডেলে নিশ্চল অবস্থার বিন্দু।

এভাবে রিকার্ডো দেখিয়েছেন যে, জনসংখ্যার চাপ, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান এবং তার ফলে ক্রমবর্ধমান খাজনা ও জমিদার শ্রেণির অনুৎপাদক কাজকর্মের ফলে কোনো সমাজ বা দেশ একটি নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছায়। রিকার্ডোর মতে, জনসংখ্যার চাপ বাড়লে এবং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন চাষিদের মধ্যে চাষের জমি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ে। ফলে খাজনা বাড়ে। কিন্তু জমিদার শ্রেণি হল অনুৎপাদনশীল শ্রেণি। তারা চাষিদের দ্বারা সৃষ্ট এই উদ্বৃত্ত জমির মালিকানার জোরে আত্মসাৎ করে এবং তা ভোগবিলাসে নষ্ট করে। এই সমস্ত কারণে দেশটি নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছায়।

রিকার্ডোর বক্তব্যটি আমরা অর্থনীতিবিদ Baumol প্রদত্ত একটি বিকল্প রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারি (চিত্র ৪.২)। এই চিত্রে উল্লম্ব অক্ষে আমরা খাজনা বাদ দিয়ে মোট উৎপাদন (TP) এবং মোট মজুরি পরিমাপ করেছি। অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। আমাদের মোট উৎপাদন (খাজনা বাদে) রেখা TP অনুভূমিক অক্ষের দিকে অবতল। এর পিছনে কাজ করছে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম। মজুরির হার জীবনধারণের স্তরে স্থির রয়েছে। সুতরাং মোট মজুরি রেখা (OW) একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা। এখন, মনে করি, প্রাথমিক শ্রম নিয়োগের পরিমাণ হল OL_1। তখন মোট মজুরি হল S_1L_1 এবং মোট উৎপাদন হচ্ছে R_1L_1। সুতরাং মোট উদ্বৃত্ত বা মুনাফা = $R_1L_1 - S_1L_1 = R_1S_1$। এই মুনাফা পুনরায় বিনিয়োজিত হলে মূলধন গঠন হবে এবং

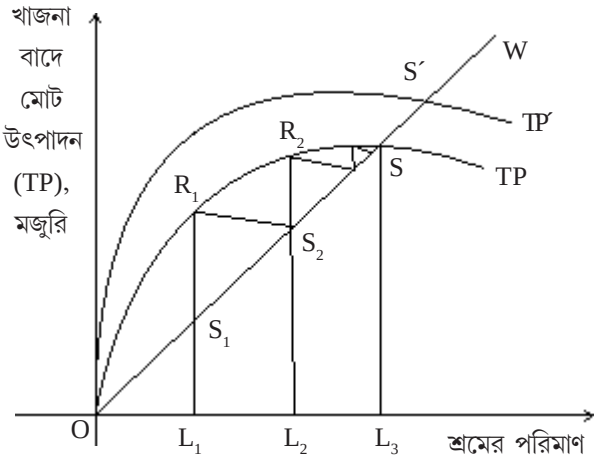

চিত্র : ৪.২

শ্রমিক নিয়োগ বাড়বে। মনে করি, শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ হল OL_2। এভাবে একসময় অর্থনীতিটি S বিন্দুতে পৌঁছাবে। S বিন্দুতে মোট উৎপাদন = SL_0 এবং মোট মজুরি = SL_0। সুতরাং S বিন্দুতে মোট মুনাফার পরিমাণ শূন্য। তখন মূলধন গঠন থেমে যাবে। উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতি আর বাড়বে না। S বিন্দু হল নিশ্চল অবস্থার বিন্দু। কারিগরি উন্নতি ঘটলে TP রেখা উপরের দিকে সরে যাবে। মনে করি এর নতুন অবস্থান হল TP′। তখন S′ হবে নিশ্চল অবস্থার বিন্দু। অর্থাৎ কারিগরি উন্নতি ঘটলে নিশ্চল অবস্থা আসতে দেরি হবে কিন্তু এটাকে ঠেকানো বা এড়ানো যাবে না।

সমালোচনা : রিকার্ডোর মডেলের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে।

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান না-ও ঘটতে পারে। এই তত্ত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

(২) এই তত্ত্বটি মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছে। কিন্তু ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) রিকার্ডোর মডেলে কোনো স্থির মূলধন নেই—সবটাই পরিবর্তনীয় মূলধন। এটিও মডেলের একটি ত্রুটি।

(৪) অন্যান্য ধ্রুপদি মডেলের ন্যায় এখানেও ধরে নেওয়া হয়েছে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, সরকারি হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি প্রভৃতি। এগুলি বাস্তবসম্মত অনুমান নয়।

পরবর্তীকালে রিকার্ডোর মডেলের উপর ভিত্তি করে অনেক উন্নততর মডেল গড়ে উঠেছে। এখানেই রিকার্ডো মডেলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

৪.৪ ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে মার্ক্স-এর তত্ত্ব

মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের নানা অন্তর্নিহিত সংঘাতের জন্য এরূপ অর্থব্যবস্থায় সংকট অবশ্যম্ভাবী। মার্ক্সের লেখায় আমরা ধনতন্ত্রের সংকটের একাধিক তত্ত্ব পাই। সেই তত্ত্বগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার (falling tendency of the rate of profit) দরুন সংকট এবং (২) দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য তুলতে না পারার সংকট (realisation crisis)। দ্বিতীয় ধরনের সংকটের আবার দুটি রূপ হতে পারে : (ক) বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের অসমানুপাতের দরুন সংকট (disproportionality crisis) এবং (খ) ভোগ ঘাটতিজনিত সংকট (underconsumption crisis)।

প্রথম ধরনের (১নং) সংকটের ক্ষেত্রে ধরা হয় যে, পণ্যগুলি তাদের ভারসাম্যের মূল্যেই বিক্রি হচ্ছে। দ্বিতীয় ধরনের (২নং) সংকট দেখা দেয় যখন পণ্যগুলি (commodities) তাদের ভারসাম্য মূল্যে বিক্রি হয় না।

আমরা ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে মার্ক্স-এর এই তিনটি তত্ত্ব একে একে আলোচনা করব।

৪.৪.১ মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতাজনিত সংকট

ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি তার টাকা (M) দিয়ে বাজার থেকে মূলধন ও শ্রমশক্তি কেনে। এর দ্বারা সে পণ্য (C) উৎপাদন করে। পণ্য উৎপন্ন হলে তা নিয়ে সে পুনরায় বাজারে আসে। ঐ পণ্য বাজারে বিক্রি করে সে আবার টাকা (M′) পায়। সুতরাং, এক্ষেত্রে, টাকা বা মূলধনের চক্র বা আবর্তনটি হল : M – C – M′। এক্ষেত্রে, M′ ও M এর পার্থক্য বা ΔM হল পুঁজিপতির মুনাফা। এই মুনাফা আহরণের জন্যই পুঁজিপতি পণ্য উৎপাদন করে থাকে। পুঁজিপতির লক্ষ্য হল ΔM-কে যথাসম্ভব বেশি করা। শুধু ΔM-এর আয়তনই সে বিচার করে না। সে বিবেচনা করে এই ΔM তার প্রাথমিক মূলধনের অংশ হিসাবে কতটা অর্থাৎ সে নির্ণয় করে $\Delta M/M$-এর মান। এই $\Delta M/M$ হল মুনাফার হার। (বস্তুতপক্ষে, $\Delta M/M \times 100$ হল মুনাফার শতকরা হার)। এই মুনাফার হারই পুঁজিপতির আগ্রহের বিষয়।

এখন, এই দ্রব্য উৎপাদন করে তা বিক্রির পর দুটি অবস্থা দেখা দিতে পারে। (ক) ΔM শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে। সেক্ষেত্রে পুঁজিপতির উৎপাদনের কোনো প্রেরণা থাকে না। সে তার পুঁজি সরিয়ে আনবে। ফলে মূলধন সঞ্চালন বা মূলধনের আবর্তন সংকুচিত হবে। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেবে। (খ) এমন হতে পারে যে, ΔM ধনাত্মক। সুতরাং $\Delta M/M$ ও ধনাত্মক হবে। কিন্তু ধরা যাক $\Delta M/M$ ধনাত্মক হলেও সেই মান পুঁজিপতির কাছে প্রত্যাশিত বা স্বাভাবিক হারের থেকে কম মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রেও পুঁজিপতি তার মূলধন বা পুঁজি তুলে নেবে। ফলে সংকট দেখা দেবে। সুতরাং, ধনতন্ত্রে সংকটের উদ্ভবের জন্য মুনাফার হার শূন্য বা ঋণাত্মক হবার দরকার নেই। মুনাফার হার স্বাভাবিকের কম বা প্রত্যাশিত হারের চেয়ে কম হলেই সংকট দেখা দিতে পারে।

মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রে যত মূলধন গঠন এগিয়ে চলে, ততই মুনাফার হার হ্রাস পাবার একটা ঝোঁক বা প্রবণতা কাজ করে। অর্থাৎ, মূলধন চয়নের (capital accumulation) মধ্যেই মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক নিহিত থাকে। মার্ক্স বলেছেন, মূলধন চয়ন যতই এগোতে থাকে, উৎপাদন পদ্ধতি অধিকমাত্রায় যন্ত্রময় হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে একদিকে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ে, অন্যদিকে মূলধনের আঙ্গিক গঠন (organic composition of capital বা সংক্ষেপে OCC) বাড়তে থাকে। আর মূলধনের আঙ্গিক গঠন বাড়ার ফলে মুনাফার হার হ্রাস পাবার একটা ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে পুঁজিপতি বিনিয়োগে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। আবার, মুনাফার হার হ্রাস পেলে পুঁজিপতি মোট মুনাফা বাড়াতে অথবা একই রাখতে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বাড়াতে চাইতে পারে। ফলে অত্যুৎপাদনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপুল পরিমাণ পণ্যকে বাজারে বিক্রি করার অসুবিধা বাড়তে থাকে। এভাবে ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দিতে পারে। এটিই হল মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার সঙ্গে জড়িত সংকটের মূলকথা।

মূলধন-চয়নের সাথে সাথে মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁকটিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে। মার্ক্সের তত্ত্বে, মুনাফার হার, $r=\frac{\text{উদ্বৃত্ত মূল্য}}{\text{মোট মূলধন}}=\frac{S}{C+V}$, যেখানে S = মোট উদ্বৃত্ত, C = স্থির

মূলধন, V = পরিবর্তনীয় মূলধন। এখন $r = \frac{S}{C+V} == \frac{S}{V} \cdot \frac{V}{C+V} = \frac{S}{V}\left(1 - \frac{C}{C+V}\right) = s'(1-q)$

যেখানে $\frac{S}{V} = s'$ হল উদ্বৃত্ত মূল্যের হার এবং $\frac{C}{C+V}$ বা q হল মূলধনের আঙ্গিক গঠন। তাহলে, আমরা পাই, মুনাফার হার, $r = s'(1 - q)$। এখন, যত মূলধন গঠন এগিয়ে চলে, স্থির মূলধনের পরিমাণ (C) বাড়ে। ফলে $\frac{C}{C+V}$ বা q বাড়ে। এখন যদি আমরা ধরে নিই যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার (s′) স্থির থাকে, তাহলে মূলধনের আঙ্গিক গঠন (q) যত বাড়বে, মুনাফার হার তত কমবে। তবে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার (s′) স্থির বা অপরিবর্তিত নাও থাকতে পারের। সেক্ষেত্রে q-এর বাড়ার ফল s′-এর পরিবর্তনের দ্বারা পূরণ হয়ে যেতে পারে। এজন্যই বলা হচ্ছে যে, ধনতন্ত্রে মূলধন চয়নের ফলে মুনাফার হার কমার একটা 'ঝোঁক' বা 'প্রবণতা' থাকবে।

মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে।

(i) পুঁজিপতির মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতাকে রুখতে চাইবে শোষণের হার বাড়িয়ে। আমাদের মুনাফার হার পেয়েছি, $r = s'(1 - q)$। এখন, q বাড়লে বা $(1 - q)$ কমলে r কমার প্রবণতা দেখা দেয়। সেই প্রবণতাকে আটকানো যেতে পারে $s'\left(= \frac{s}{v}\right)$ বা শোষণের হার বাড়িয়ে। কিন্তু তার ফলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হবে। সেই সংঘাতের ফলেও ধনতন্ত্রে সংকট আরো ঘনীভূত হবে।

(ii) মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁকের দরুন পুঁজিপতিদের মধ্যে, পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। এটিও পরিণামে ধনতন্ত্রে সংকট ডেকে আনবে বলে মার্ক্স মনে করেন।

(iii) বিদেশ থেকে সস্তায় মজুর ও কাঁচামাল এনে মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক কমানোর চেষ্টা হবে। ফলে উপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বৃদ্ধি পাবে।

(iv) মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক দেখা দিলে পুঁজিপতিরা মোট মুনাফা বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সেজন্য তারা মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবে। কিন্তু বাজারের সেই বিপুল পরিমাণ দ্রব্য বিক্রির ক্ষমতা নেই। ফলে অধিক উৎপাদনের সংকট দেখা দেবে।

এক কথায়, মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক এবং তার প্রতিরোধী শক্তিগুলির কাজকর্মের দরুন ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংঘাত বা বিরোধগুলি তীব্রতর হয়ে উঠবে। এর ফলে ধনতন্ত্রে সংকট ঘনীভূত হবে বলে মার্ক্স মনে করেন।

৪.৪.২ অসমানুপাতজনিত সংকট

আমরা বলেছি যে, মার্ক্সের আলোচনায় আমরা ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে একাধিক তত্ত্ব পাই। সেই তত্ত্বগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল : মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার দরুন সংকট

এবং অপরটি হল পণ্যের পূর্ণমূল্য তুলতে না পারার সংকট (realisation crisis)। ধনতন্ত্রে যখন পুঁজিপতি তার উৎপন্ন পণ্যের পুরো মূল্য বাজার থেকে তুলতে পারে না এবং এর ফলে মুনাফা কমে, বিনিয়োগ কমে এবং ধনতন্ত্রে সংকট শুরু হয়, তখন তাকে বলে পণ্যের পূর্ণমূল্য তুলতে না-পারার সংকট। এটি আমার দু'রকমের হতে পারে। একটি হল : শ্রমিক শ্রেণির স্বল্প ক্রয়ক্ষমতার ফলে ভোগঘাটতিজনিত সংকট এবং অপরটি হল : অসমানুপাতজনিত সংকট। আমরা এখন এই অসমানুপাতজনিত সংকট নিয়ে আলোচনা করব।

ধনতন্ত্রে অসমানুপাতজনিত সংকটের পিছনে মূল কারণ হল উৎপাদনে পরিকল্পনার অভাব। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনাহীনতা এবং নৈরাজ্যের দরুন এই ধরনের সংকটের উদ্ভব ঘটে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা বাজারের চাহিদা সম্পর্কে অনুমান করে উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিটি পুঁজিপতি অনিশ্চিত বাজারের জন্য উৎপাদন করে। এই বাজারের সম্ভাব্য চাহিদা সম্পর্কে তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। সে বাজারের চাহিদা বা আয়তন হিসাব করে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে। তাই কখনও অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদন হয়, আবার কখনও অতি কম পরিমাণ উৎপাদন হয়। ফলে দাম কখনও খুব কমে যায়, আর কখনও খুব বেড়ে যায়। তখন পুঁজিবাদীরা তাদের সিদ্ধান্তের সংশোধন করতে তৎপর হয়। শুরু হয় পূরণমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন। যে সমস্ত পণ্যের দাম কমে গেছে অধিক উৎপাদনের দরুন, সেগুলির উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর যে সমস্ত পণ্যের দাম বেড়ে গেছে কম উৎপাদনের দরুন, সেগুলির উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার (trial and error) মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদনের পরিমাণগুলির মধ্যে সঠিক অনুপাত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য সকল কিছু, যেমন, উৎপাদন পদ্ধতি, ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস, শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকলে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উৎপাদন স্তরের ওঠানামার মধ্য দিয়ে একসময় এই উৎপাদনের পরিমাণগুলির সঠিক অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে না। ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস, উৎপাদন কৌশল, শ্রমের উৎপাদনশীলতা, পুঁজিপতিদের প্রত্যাশা ইত্যাদি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। তাই অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন হয় না। মার্ক্সের মতে, দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের এই অসমানুপাতের ফলে ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দেয়। একেই অসমানুপাতজনিত সংকট (disproportionality crisis) বলা হয়।

মার্ক্স মনে করেন যে, ধনতন্ত্রে এই সংকট উদ্ভূত হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনাহীনতা এবং নৈরাজ্যের (anarchy) জন্য। তিনি বলেছেন যে, ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণগুলির কাম্য বা সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নেই। তাই এই উৎপাদন ব্যবস্থায় এক ধরনের নৈরাজ্য চলতে থাকে। পুঁজিপতিরা তাদের নিজ নিজ প্রত্যাশার ভিত্তিতে এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বাজারের ক্ষমতার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন হয় না। আর তার ফলেই অর্থনীতিতে সংকট শুরু হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যখন অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্রে অতি উৎপাদন এবং কিছু ক্ষেত্রে কম উৎপাদন ঘটে এবং যার ফলে কিছুক্ষেত্রে দাম খুব কম এবং কিছু ক্ষেত্রে দাম খুব বেশি হয় এবং এর জন্য অর্থনীতিতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়, তাকেই অসমানুপাতজনিত সংকট বলে।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে, বিশেষত অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বে, আমরা এই অসমানুপাতজনিত সংকট পাই না। অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বে দেখা যায় যে, বাজার ব্যবস্থা বা অদৃশ্য হস্ত সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। সেখানে বাজারের স্বয়ংক্রিয় শক্তি কাজ করার ফলে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমতা আসে। তা ছাড়া, ক্লাসিক্যাল বা প্রাচীন তত্ত্বে দেখা যায় যে, যদি দ্রব্যের দাম ও শ্রমের মজুরি নমনীয় (flexible) বা পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজ করবে। কিন্তু এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। বাস্তবে মজুরির হার নমনীয় হয় না। পরবর্তীকালে কেইনস্ তাঁর আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমের বাজারে বেকারত্ব এবং দ্রব্যের বাজারে অতি উৎপাদনের বা বাড়তি জোগানের সমস্যা থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রাচীন তত্ত্বে দ্রব্য ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে বলে অনুমান করা হয়। সেক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে সচল বলে ধরা হয় এবং উৎপাদকের বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। কিন্তু মার্ক্স বলেছেন যে, ধনতন্ত্রে উৎপাদকের বাজার সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তার জন্যই কোনো দ্রব্যের অতি উৎপাদন এবং কোনো দ্রব্যের কম উৎপাদন ঘটে থাকে। এটি অবশেষে ধনতন্ত্রে সংকট সৃষ্টি করে।

অনেকে অবশ্য এই অসমানুপাতজনিত সংকটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। কিন্তু তাঁদের এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। ধরা যাক, পুঁজিপতিরা A দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কে বেশি হিসাব করেছে। ফলে A দ্রব্যের অনেক বেশি উৎপাদন হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের সবটাই বাজারে লাভজনকভাবে বিক্রি হবে না। ফলে পুঁজিপতিরা এরপর A দ্রব্যের উৎপাদন কমাবে। তার ফলে শ্রমিক, A দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ প্রভৃতির চাহিদাও কমবে। সুতরাং, A দ্রব্যের উৎপাদনের সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া, A দ্রব্যের উৎপাদন যদি দেশটির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং পুঁজিপতিদের হিসাবে যদি বড় আকারের ভুল থাকে, তাহলে A দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রেও বড় আকারের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা বেশ বড় আকার ধারণ করবে এবং তা অর্থনীতিতে সংকট ডেকে আনবে। Tugan-Baranowsky অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি সংকট সম্পর্কে অপর দুই ব্যাখ্যাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। যেমন, মুনাফার হার কমার প্রবণতার সঙ্গে জড়িত সংকট সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, মূলধনের আঙ্গিক গঠন বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। ফলে মুনাফার হার বাড়বে, কমবে না। ভোগ ঘাটতিজনিত সংকটও নানাভাবে এড়ানো যায় বলে তিনি মনে করেন। তাই ধনতন্ত্রে অসমানুপাতজনিত সংকটকেই তিনি সংকটের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। তবে এর ফলে ধনতন্ত্রের পতন ঘটবে কিনা তা বলা সম্ভব নয়। মার্ক্স বলেছিলেন, ধনতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধনতন্ত্রের বিভিন্ন সময়ে সংকট দেখা দিলেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আসলে ধনতন্ত্রের বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য নিয়ন্ত্রিত আকারে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে মার্ক্স ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিকল্পনাহীনতা ও নৈরাজ্যের কথা বলেছেন, সেই অবস্থা বর্তমানে নেই। বর্তমানে অনেক দেশেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র (regulated capitalism)। এভাবে মার্ক্স বর্ণিত ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি কিছুটা দূর করে ধনতন্ত্র তার নিজের পতন এড়াতে এখনো পর্যন্ত সক্ষম হয়েছে। বরং তৎকালীন সোভিয়েত

রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে এবং ঐ দেশগুলিতে বাজার ব্যবস্থা ফিরে এসেছে বা ফিরে আসছে।

৪.৪.৩ ভোগঘাটতিজনিত সংকট

মার্ক্সের লেখায় আমরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তত্ত্ব সম্পর্কে একাধিক তত্ত্ব পাই। এক ধরনের তত্ত্বে বলা হয় যে, ধনতন্ত্রে পণ্যের পূর্ণ মূল্য তুলতে না-পারার জন্য সংকট দেখা দিতে পারে। এ ধরনের সংকটকে মার্ক্স পণ্যের মূল্য তুলতে না-পারার সংকট বা realisation crisis বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য বাজার থেকে তোলা বা realise করা যাচ্ছে না। তাই একে realisation crisis বলা হচ্ছে। এ ধরনের সংকটের আবার দুটি রূপ বা ধরন হতে পারে। একটি হল অসমানুপাতজনিত সংকট এবং অপরটি হল ভোগ ঘাটতির সংকট। আমরা আগের বিভাগে (বিভাগ ৪.৪.২) অসমানুপাতজনিত সংকট নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান বিভাগে (বিভাগ ৪.৪.৩) আমরা ভোগঘাটতিজনিত সংকট নিয়ে আলোচনা করব।

ভোগ ঘাটতির সংকটের দুটি ব্যাখ্যা আছে। একটি মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা এবং অপরটি সুইজির ব্যাখ্যা। মার্ক্সের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ধনতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণির কম ভোগের দরুন কার্যকরী চাহিদা কম হতে পারে এবং তার ফলে সংকট দেখা দিতে পারে। আমরা জানি, শ্রমিকদের আয় তুলনামূলকভাবে কম। তাদের অনেক ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা অপূরিত থাকে। ফলে তাদের ভোগ প্রবণতা বেশি এবং সঞ্চয় প্রবণতা কম। শ্রমিকরা তাদের আয়ের প্রায় সবটাই ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করে। অন্যদিকে, পুঁজিপতিরা তাদের আয়ের অতি সামান্য অংশই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে। এখন, মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রে যতই উন্নয়নের ধারা চলতে থাকে এবং মূলধন চয়ন এগিয়ে চলে, ততই উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিরা আহরণ করে। শ্রমিকদের শোষণ বাড়তে থাকে এবং সর্বহারা শ্রেণির দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। মোট আয়ের বড় অংশ পুঁজিপতি পায় এবং কম অংশই শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণি পেয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আয় বণ্টন পুঁজিপতির অনুকূলে এবং সর্বহারাদের প্রতিকূলে যেতে থাকে। এভাবে মূলধন চয়নের সাথে সাথে সর্বহারা শ্রেণির ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যকরণ (increasing immiserisation of the proletariat) ঘটতে থাকে। এর ফলে ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা কমে। তার দরুন মূলধনের চাহিদা বা বিনিয়োগ ব্যয়ও কমে। সুতরাং মোট বা কার্যকরী চাহিদা (= মোট ভোগব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় = C + I) কমে যায় এবং তা ধনতন্ত্রে সংকট নিয়ে আসে। মার্ক্সের এই ভোগঘাটতিজনিত সংকট তত্ত্ব কেইন্‌স্‌-এর অপর্যাপ্ত কার্যকরী চাহিদা (lack of effective demand) তত্ত্বের খুব কাছাকাছি। কেইন্‌স্‌-এর পূর্বে অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসও চাহিদার অভাব বা জোগানের প্রাচুর্যের তত্ত্ব (Theory of Glut) দিয়েছেন। তাঁর মতে, যত প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটবে, একজন শ্রমিক যা উৎপাদন করবে, তা তার ভোগের জন্য লাগবে না। সুতরাং বাজারে চাহিদার ঘাটতি বা বাড়তি জোগানের সমস্যা দেখা দেবে। তাই মার্ক্স-এর ভোগ ঘাটতিজনিত তত্ত্বের সমগোত্রীয় হিসাবে আমরা ম্যালথাসের তত্ত্ব এবং কেইন্‌সের তত্ত্বের উল্লেখ করতে পারি।

অধ্যাপক সুইজি ভোগ ঘাটতিজনিত সংকটের দ্বিতীয় এবং কিছুটা উন্নততর তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি দুটি অনুমান করেছেন। এক, শ্রমিকরা তাদের মজুরির সবটাই ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয় করে।

দুই, পুঁজিপতির আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত মূল্য চার ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে :

(i) পুঁজিপতির পূর্ব হারে ভোগ ব্যয়, (ii) পুঁজিপতির ভোগ বৃদ্ধি, (iii) বাড়তি শ্রমিক নিয়োগের ব্যয় এবং (iv) স্থির মূলধন বাড়ানোর ব্যয়। বর্তমান সমষ্টিগত তত্ত্বে চতুর্থটিকে বলা হয় বিনিয়োগ ব্যয়। আর (iii) এবং (iv) নং-কে একসঙ্গে মার্ক্সের অর্থে মূলধন চয়ন বা মূলধন গঠন বলা যেতে পারে। এই দুটি অনুমানের সাহায্য নিয়ে সুইজি (Sweezy) দেখিয়েছেন যে, দীর্ঘকালে ধনতন্ত্রে ভোগ্য দ্রব্যের জোগানের বৃদ্ধির হারের চেয়ে ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধির হার কম হবার প্রবণতা থাকবে। এই প্রবণতা ধনতন্ত্রে মন্দা এবং সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

ভোগ ঘাটতির সংকটকে আটকানোর জন্য সুইজি কতকগুলি প্রতিরোধী শক্তির (counteracting forces) কথা বলেছেন। এই শক্তিগুলি হল : (i) নতুন শিল্পের প্রসার, (ii) ভুল বিনিয়োগ, (iii) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (iv) অনুৎপাদনশীল ভোগ এবং (v) সরকারি ব্যয়। প্রথম দুটি শক্তি মূলধনি দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায়। শেষ তিনটি বিষয় ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায়। ফলে ভোগঘাটতির সংকট বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা এই বিষয়গুলির সঙ্গে আরো দু'একটি বিষয় যোগ করতে পারি। একটি হল সরকারের হস্তান্তর প্রদান (বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, পেনশন প্রভৃতি) বৃদ্ধি। এসবের ফলে দেশে ভোগ ব্যয় বাড়বে। দ্বিতীয়টি হল, উপযুক্ত কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়ের বণ্টন সুষম করা। এতেও ভোগ ব্যয় বাড়বে। অবশ্য অবাধ অর্থনীতিতে এগুলি করার পরিসর কম। ভোগ ব্যয় বাড়ানোর আর একটি পন্থা হতে পারে রপ্তানি বৃদ্ধি। উপযুক্ত বাণিজ্য নীতির দ্বারা অথবা উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা বিদেশের বাজার দখল করলে মোট চাহিদা বাড়বে এবং তা ভোগ ঘাটতির সংকটে বাধা দেবে।

৪.৫ ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের মধ্যে নানা সংঘাত বা অন্তর্বিরোধ থাকার ফলে একসময় ধনতন্ত্রের পতন ঘটবে। ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি পুঁজির মালিকানার জোরে শ্রমিককে শোষণ করে। শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্তকে সে আত্মসাৎ করে। ফলে শ্রমিক-মালিক সংঘাতের উদ্ভব ঘটে। আবার, ধনতন্ত্রে নানা ধরনের সংকট দেখা দেয়। ধনতন্ত্রে যতই মূলধন গঠন এগিয়ে চলে, মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা দেয়। তখন পুঁজিপতির বিনিয়োগের উৎসাহ কমে। এভাবেও ধনতন্ত্রে সংকট তৈরি হয়। আবার, ধনতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণির ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের ফলেও অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হয়। ফলে উৎপন্ন পণ্যের বাজারের সমস্যা দেখা দেয়। এভাবে ধনতন্ত্রে ভোগঘাটতির সংকট দেখা দেয়। আবার, ধনতন্ত্রে পরিকল্পনাহীনতা এবং নৈরাজ্যের দরুন কোথাও অতি উৎপাদন আর কোথাও স্বল্প উৎপাদন হতে পারে। এর ফলেও ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দেয়। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে, ধনতন্ত্রের এই সমস্ত নানা অন্তর্বিরোধের (contradictions)

জন্য ধনতন্ত্র একসময় ভেঙে পড়বে এবং সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হবে। তবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কিন্তু আপনা আপনি ঘটবে না। ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রধানত দু'ভাবে ঘটতে পারে :

(ক) শ্রেণি সংগ্রাম ও রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

(খ) সংসদীয় পথে নানা অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে।

এই দুই বিকল্প পথ নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আমরা মার্ক্সের স্তর তত্ত্ব থেকে জানি যে, কোনো একটি দেশ বা অর্থনীতি তার উন্নয়নের সময় পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই পাঁচটি স্তর হল : আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। প্রতিটি স্তরের সঙ্গেই উৎপাদনী শক্তির বিকাশেরও একটি বিশেষ স্তর বা পর্যায় রয়েছে। আবার, প্রতিটি স্তরেরই একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনী সম্পর্কও রয়েছে। মার্ক্সের মতে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদনী শক্তির যে হারে বিকাশ ঘটে, উৎপাদনী সম্পর্কের সে হারে পরিবর্তন ঘটে না। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সংঘাত তৈরি হয়। নতুন বিকশিত উৎপাদনী শক্তিকে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ক ধরে রাখতে (accommodate) বা তার নিজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। নতুন উৎপাদনী শক্তির চাপেই পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ক ভেঙে যায়। এভাবে অর্থনীতিটির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ বা বিবর্তন ঘটে। মার্ক্সের এই তত্ত্বকে বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এভাবেই সমাজে আদিম সাম্যবাদ থেকে দাস প্রথা ও সামন্ততন্ত্র পার হয়ে ধনতন্ত্র এসেছে। কিন্তু মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আপনা আপনিই ঘটবে না। ধনতন্ত্রের সংকটের প্রধান কারণ হল মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা। এই মালিকানার জোরেই পুঁজিপতি শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে। সুতরাং ধনতন্ত্রের সংকটগুলি দূর করতে হলে মূলধন বা উৎপাদনের মাধ্যমগুলির শ্রেণি মালিকানা দূর করতে হবে এবং তার পরিবর্তে এগুলির সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মার্ক্সের মতে, এটা সম্ভব হবে যদি শ্রমিকেরা শ্রেণি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। এভাবে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিক শ্রেণিকেই এই আন্দোলনে বা শ্রেণি সংগ্রামে সমষ্টিগতভাবে অংশ নিতে হবে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। সর্বহারা শ্রেণি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করবে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের মাধ্যমগুলির সামাজিক মালিকানা। এক্ষেত্রে মূলধনের বা উৎপাদনের মাধ্যমগুলির শ্রেণি-মালিকানা থাকে না। এভাবে সমাজতন্ত্রে মূলধনের সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে। তাদের মধ্যে বিরোধ বিলুপ্ত হয়।

রাশিয়ায় 1917 সালে এই মার্ক্সবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন লেনিন। তিনি রুশ জনগণের বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করার কাজে নেতৃত্ব দেন। তিনি তাদের অত্যাচারী জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র

সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। রাশিয়ায় সে সময় চলছিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, জ্বালানি-ঘাটতি, বিপর্যস্ত পরিবহন ব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রে চরম অরাজকতা। দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ধর্মঘট চলতে থাকে। অবশেষে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে 1917 সালর মার্চ মাসে দেশে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। সংবিধান মান্যকারী গণতন্ত্রবাদী কিছু ব্যক্তি এবং একদল অকম্যুনিষ্ট মিত্রদের সাহায্যে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু এই সরকার ছিল স্বল্পস্থায়ী। ইতিমধ্যে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তার বিপ্লবী কাজকর্ম খোলাখুলিভাবে শুরু করে। পার্টি স্লোগান দেয় ঃ "বিপ্লবকে তার পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাও।" দেশবাসীকে সোভিয়েত সরকারের হাতে সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়। অবশেষে বলশেভিক পার্টি অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের পতন ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। 1917 সালের 7 নভেম্বর নতুন সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমজীবী শ্রেণি পায় শাসক শ্রেণির মর্যাদা এবং কমিউনিসট পার্টি শাসক দলরূপে পরিগণিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে এই ঘটনা নভেম্বর বিপ্লব (বা রুশ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী অক্টোবর বিপ্লব) নামে পরিচিত। এই বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী সময়ে কিউবা, ভিয়েতনাম, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশে এরূপ সশস্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ধনতন্ত্র অথবা সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী চিনেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় বিপ্লবের মাধ্যমে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ্-এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয় চৈনিক সাম্যবাদী বিপ্লব (Chinese Communist Revolution)। এর ফলে 1949 সালে 1 অক্টোবর People's Republic of China প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথটি হল সংসদীয় পথ। এক্ষেত্রে আসলে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ পরিহার করে পরিকল্পনার সাহায্যে সরকারি বা সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের প্রসার ঘটানো হয়। আসলে সোভিয়েতের উন্নয়ন মডেল, তার সাফল্য দেখে অনেক দেশই সোভিয়েত মডেল গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। কিন্তু এই দলগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে হাঁটতে চায়নি। কারণ এই দেশগুলির কাছে বিপ্লব অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্যক্রম এবং এতে অনেকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট নয়, অনেককে শ্রেণিশত্রু বলে বিবেচনা করে তাদের উপর অত্যাচার এমনকি তাদের খতম করা হয়। তাই এই দেশগুলি ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলেছে। অনেক অর্থনীতিবিদ এই সংসদীয় এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে এগিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানোকে সমর্থন করেছেন। যেমন, হিগিন্স্ বলেছেন, বাজারি শক্তির অবাধ বা খোলা কাজকর্মের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতি হয় না। তাই তিনি সচেতনভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির পরিবর্তনের কথা বলেছেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালও বাজারের বদলে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার উপর জোর দিয়েছেন। অধ্যাপক হার্শম্যান, অধ্যাপক পল ব্যারন প্রভৃতি অর্থনীতিবিদও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দেশে 1950-এর দশকে পরিকল্পনার যুগ শুরু হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ (socialistic pattern of society) প্রতিষ্ঠা। বস্তুত, সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হয়ে প্রথম পরিকল্পনার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারি ক্ষেত্রের

গুরুত্ব অনেকগুণ বাড়ানো হয়। সরকারি বা সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব 1980-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর অবশ্য ভারত অবশ্য ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে আসতে থাকে। 1991 সালে নতুন শিল্পনীতি প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে, ভারত পুনরায় বাজার অর্থনীতির দিকে সরে যাচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্র বা বাজার ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা পাশাপাশি বিরাজ করছে। একে বলা হচ্ছে বাজার-সমাজতন্ত্র (Market Socialism)। অনেকে এগুলিকে 'নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র' বা Regulated Capitalism বলতে বেশি পছন্দ করেন। চিনের বর্তমান অর্থনীতিকেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলতে অনেকের আপত্তি। তাঁরা চিনের বর্তমান অর্থনীতিকে বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্র বা নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র আখ্যা দিতে চান।

৪.৬ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরের অভিজ্ঞতা

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এবং গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই দুটি দেশে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা কেমন, তা এই বিভাগে আলোচনা করব।

৪.৬.১ সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা

1917 সালের নভেম্বর মাসে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তনের পর কয়েকটি দেশ ও রাশিয়া মিলে সোভিয়েত রাশিয়া গঠিত হয়। সোভিয়েত গঠনের পর কয়েকটি বছর ছিল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের বছর। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy বা NEP) প্রবর্তিত (1921-28) হয়। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি সরকারি মালিকানায় এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি ব্যক্তি মালিকানায়—এই ছিল NEP বা নেপ্-এর সাধারণ রূপ। অর্থাৎ নেপ্ ছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ছিল একান্তই সাময়িক এবং এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সমাজতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্তালিন নেপ্ পরিত্যাগ করেন 1927 সালে এবং 1928 সাল থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয়। আর তার পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত উন্নতি শুরু হয়। সোভিয়েত উন্নয়নের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (i) অতি স্বল্পকালে শিল্পের দ্রুত উন্নতি, (ii) বিনিয়োগের দ্রুত বৃদ্ধি, (iii) কৃষি থেকে শিল্পে সম্পদের দ্রুত অপসরণ, (iv) শ্রম নিয়োগের পরিমাণে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং এসবের ফলস্বরূপ জাতীয় আয়ের দীর্ঘকাল ধরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। আমরা এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করব।

(i) পরিকল্পনার যুগে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়ে। 1913 সালে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অংশ ছিল 33 শতাংশ। 1950 সালে তা বেড়ে হল 50 শতাংশ; 1970 সালে দাঁড়ায় প্রায় 65 শতাংশ।

(ii) পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের হারও খুব দ্রুত হারে বাড়ে। যেমন, 1913 সালে বিনিয়োগের হার ছিল স্থূল জাতীয় উৎপাদনের শতকরা 12.5 ভাগ। 1935 সালে তা বেড়ে শতকরা 32 ভাগে পৌঁছায়। কোনো পশ্চিমী উন্নত দেশে বিনিয়োগের হার এত দ্রুত হারে বাড়েনি।

(iii) সোভিয়েত অর্থনীতিতে খুব দ্রুতহারে কৃষি থেকে শিল্পে উপকরণের অপসরণ ঘটেছে। 1928 সালে নিট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল শতকরা 49 ভাগ। 1940 সালে অর্থাৎ মাত্র 12 বছরে, তা কমে দাঁড়ায় শতকরা 29 ভাগ।

(iv) সোভিয়েত উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ক্রমশ বিপুল আয়তনের শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় লোক শ্রমে যোগদান করেছিল।

এসবের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। অতি অল্প সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হয়। কিন্তু 1950-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত উন্নয়নের কয়েকটা ত্রুটি দেখা দিতে থাকে। (i) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, দ্রব্যের পরিমাণ ইত্যাদির বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। (ii) মূলধনি দ্রব্যের শিল্পের উপর জোর দেওয়ার ফলে ভোগ্য দ্রব্যের শিল্প অবহেলিত হয়। ভোগ্য দ্রব্যের মান বাড়েনি। ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। (iii) কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়। চাষিদের উচ্চহারে শোষণ করা হয়। এমনকি তাদের গতিবিধির উপরও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। (iv) ম্যানেজাররা দ্রব্যের পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গিয়ে দ্রব্যের গুণমান উপেক্ষা করেছেন। (v) জনসাধারণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকায় এবং ভোগের ক্ষেত্রে দ্রব্য নির্বাচনে স্বাধীনতা না থাকায় রুশ জনগণের অসন্তোষ বাড়তে থাকে। (vi) অধিক কেন্দ্রিকতার ফলে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে অনেক ত্রুটি দেখা যায়। (vii) প্রশাসনে দীর্ঘসূত্রতা ও আমলাতান্ত্রিকতা দেখা দেয়। এসবের ফলে রুশ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

1985 সালে মিখাইল গোর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে ক্ষমতায় আসেন। সোভিয়েত অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য এবং জনসাধারণের মত প্রকাশের ও ভোগের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য তিনি দুটি কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। একটি হল পেরেস্ত্রৈকা (Perestroika অর্থাৎ restructuring বা পুনর্গঠন) এবং অপরটি হল গ্লাসনস্ত (Glasnost অর্থাৎ openness বা খোলামেলা, মুক্ত আবহাওয়া)। কিন্তু এই সংস্কার যথেষ্ট ছিল না। গোর্বাচেভ আশা করেছিলেন যে, এই পেরেস্ত্রৈকার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন হবে, অর্থনীতি আবার উন্নয়নের রাস্তায় ফিরে আসবে এবং দেশের অনড়তা দূর হবে। পাশাপাশি, তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, তাঁর গ্লাসনস্ত-এর কর্মসূচির ফলে লোকের রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাড়বে এবং তার ফলে জনগণের ক্ষোভ কমবে। কিন্তু বাস্তবে এই দুই কর্মসূচি সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং আরো কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশে আরও বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য নিয়ে এল। 1989 সালে বার্লিন প্রাচীরের পতন হল এবং 1991 সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন

ভেঙে পড়ল। যা একসময় ছিল একক দেশ, তা 15টি বিচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনো চিহ্নই আর রইলো না। মহান নভেম্বর বিপ্লবের (বা অক্টোবর বিপ্লবের) যে দশদিন দুনিয়া কাঁপিয়েছিল, যা নিয়ে জন রিড-এর কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস "Ten Days that Shook the World" (দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন), যা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে বড় আশার বাণী নিয়ে এসেছিল, তার এক করুণ, বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি ঘটল। সোভিয়েত রাশিয়া বিলুপ্ত হয়ে এখন শুধুই রাশিয়া আলাদাভাবে একটি সমাজতন্ত্রী দেশ হিসাবে রয়ে গেল। সোভিয়েতের অন্যান্য সদস্য দেশগুলিতে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হল।

৪.৬.২ সমাজতান্ত্রিক চিনের অভিজ্ঞতা

1949 সালের 21 সেপ্টেম্বর মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি (CCP) সমাজতান্ত্রিক চিন স্থাপন করে। চিনের নাম হয় People's Republic of China বা চিনের গণ-প্রজাতন্ত্র। অন্তত মাও-এর যুগে (1949-76) গণ-প্রজাতন্ত্রী চিন ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, একটি পরিকল্পিত বা আদেশভিত্তিক অর্থনীতি (command economy)। 1949 সালেই চিন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে চিন উচ্চ উন্নয়নের হার অর্জন করতে সক্ষম হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে চিনের সাফল্য খুবই উজ্জ্বল। বর্তমান বিশ্বে চিন এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা বিভিন্ন নির্দেশকের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চিনের সাফল্য বিচার করব। অবশ্য 1980-র দশকে চিন উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে। তাই 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চিন আর পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক দেশ বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি নয়। বর্তমান চিনের অর্থনীতির ভিত্তি হল বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্র (market socialism)। এখন, বিভিন্ন মাপকাঠিতে চিনের সাফল্য বিচার করা যাক্। পাশাপাশি আমরা ভারতের অবস্থাটাও তুলে ধরব।

২০০৭ সালে চিনের মাথাপিছু আয় ছিল 6,770 মার্কিন ডলার। ঐ সময়ে ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল 3,260 মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতের তুলনায় চিন অনেক দ্রুতগতিতে উন্নতি করেছে। চিনের স্থূল অন্তর্দেশীয় জাতীয় উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির গড় শতকরা হার ছিল 1980-90 দশকে 10.3, 1990-2000 দশকে 10.6 এবং 2000-08 সময়কালে ছিল 10.4। মোটের উপর GDP বৃদ্ধির গড় হার 1980-2008 সালে ছিল শতকরা 10.4। বিশ্ব অর্থনীতি ঐ সময়কালে মাত্র 3-4 শতাংশ হারে প্রসার লাভ করেছে। চিনের সাফল্য এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য।

আমরা 2003 সালের নির্বাচিত কিছু মানব উন্নয়ন সূচকের দ্বারা চিনের কৃতিত্ব (performance) বিচার করতে পারি। পাশাপাশি, তুলনার সুবিধার জন্য আমরা ভারতের সংশ্লিষ্ট সূচকটিও উল্লেখ করব। কেননা, ভারত এবং চিন মোটামুটি একই সময়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু করেছে। চিন পরিকল্পনা শুরু করে 1949 সালে, আর ভারত পরিকল্পনা শুরু করে 1950 সালে। তাই পরিকল্পনাকালে উভয়ের সাফল্যের কিছু তথ্য পাশাপাশি রাখলে চিনের সাফল্য অনেকটা অনুধাবন করা যাবে।

2003 সালে ভারতের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI) ছিল 0.602, আর চিনের ছিল 0.755। 190টি দেশের মধ্যে HDI-এর ভিত্তিতে ভারতের অবস্থান ছিল 127-তম এবং চিনের অবস্থান ছিল 85-তম। বর্তমান চিত্রটাও মোটামুটি একই রকমের। ঐ সালে (2003) ভারতের জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু ছিল 63.3 বছর, আর চিনের 71.6 বছর। 15 বছর বা বেশি বয়স্কদের সাক্ষরতার হার ছিল ভারতে শতকরা 61.0 ভাগ, আর চিনে ছিল 90.9 ভাগ। 2003 সালে ভারতের মাথাপিছু GDP ছিল 2, 892 মার্কিন ডলার; আর চিনের ছিল 5,003 ডলার। প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ভারতে যেখানে 63, চিনে সেটি তুলনায় অনেক কম (30)। আর আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে 2003 সালে ভারতে 34.7 শতাংশ ব্যক্তি দারিদ্র সীমার নীচে ছিল, সেখানে চিনে ঐ সময় দারিদ্র সীমার নীচে ছিল 16.6 শতাংশ লোক। সুতরাং, সব মাপকাঠিতেই চিনের সাফল্য বেশ উজ্জ্বল এবং উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক মাপকাঠির (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, বয়স্ক সাক্ষরতার হার, নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তি প্রভৃতি) বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রী চিন বিশ্ব অর্থনীতির অনেক দেশের তুলনায় দ্রুত হারে এগিয়ে গেছে। এসমস্ত বিষয়ে চিনের কৃতিত্ব সত্যিই উল্লেখের দাবি রাখে।

তবে চিনের এই অগ্রগতি সর্বদা মসৃণপথে ঘটেনি। চিনের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সময় নানা ধারণা ও মতবাদের প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়, যেমন, সমাজতান্ত্রিক পথ, মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ প্রভৃতি। মাও-সে-তুঙ 1960-র দশকের প্রথম দিকে মনে করেছিলেন যে, চিন তার সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে এবং পুরনো ধ্যানধারণায় ফিরতে চাইছে। সেজন্য তিনি ঘোষণা করেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা Cultural revolution-এর (1966-76) কর্মসূচি। এটি হল মাও-য়ের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ও চিরাচরিত উপাদানগুলি দূর করা। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিও চিনে নানা বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন যে, চিনে মাও-সে-তুঙ-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সফল হয়নি এবং তার ফলে চিনে ধনতান্ত্রিক কাঠামো এবং উৎপাদন পদ্ধতির বীজ রয়েই গেছে। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাও মানুষের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তিনি সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। চার্চসহ সমস্ত উপাসনা স্থল ভেঙে দেওয়া হয়। পরিবর্তে সেখানে কারখানা অথবা গুদামঘর তৈরি করা হয়। বহু চার্চ লুণ্ঠিত হয়, যাজক এবং সন্ন্যাসিনীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। লাখ লাখ ব্যক্তি এই নিপীড়নে মারা যায়—কেউ অত্যাচারে, কেউ নিরন্ন উপবাসে চিনের মানুষ এগুলি মেনে নেয়নি। বর্তমান সংস্কার যুগে দেখা যাচ্ছে, মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস রয়ে গেছে।

আর সর্বোপরি ছিল মাও-য়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী Great Leap Forward বা সামনের দিকে বিরাট লাফ কর্মসূচি (1958-62)। সেই কর্মসূচি অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরি করা হয়। চিনকে যেন রাতারাতি শিল্পায়িত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কৃষিকে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়। বাড়ির পিছনের লাগোয়া স্থানে ছোট ছোট কারখানা খোলা হতে লাগলো। অনেক চাষি ক্ষোভে, বেদনায় তাদের গবাদি পশু মেরে

ফেলল। ফলে দেখা দিল ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে চিনে প্রায় 3 কোটি লোক মারা যায়। Great Leap Forward ছিল একটি আর্থসামাজিক কর্মসূচি। এর উদ্দেশ্য ছিল চিনা অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে সাম্যবাদী সমাজে (from agrarian economy to communist society) রূপান্তরিত করা। কিন্তু মাও-এর অতি আশাবাদী এবং বাস্তবতা বর্জিত পরিকল্পনা চিনের অর্থনীতিকে সমূহ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অবশেষে, নানা রাজনৈতিক ওঠানামার পর, 1978 সালে ক্ষমতাসীন সরকার অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে। এই সংস্কারের মূলকথা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব স্বীকার। এর ফলে বর্তমান চিনে যে অর্থব্যবস্থা চালু আছে তাকে অনেকে মিশ্র অর্থনীতি বলে মনে করেন। এই সংস্কারের পথেই চিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। তবে বর্তমান চিনে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লোকেদের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। অনেকে মনে করেন যে, এই রাজনৈতিক ক্ষমতার মদতে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় উদ্যোগই শ্রমিকদের শোষণ করে। শ্রমিক স্বার্থ নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়। আর সেজন্যই চিন স্বল্পব্যয়ে অনেক দ্রব্য তৈরি করতে পারে। চিন যে বিশ্ববাজারের একটা বড় অংশ দখল করেছে, তার পিছনে এই শ্রমিক শোষণ কাজ করছে বলে অনেকে মনে করেন। এটা খুবই আক্ষেপের কথা, যে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল সর্বহারার একনায়কত্ব (dictatorship of the proletariat), সেই সমাজতন্ত্রের তকমা লাগিয়ে চিন সর্বহারা শ্রেণিকে শোষণ করছে এবং এর দ্বারাই সে বিশ্ববাজারে তার আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হচ্ছে। বস্তুত, চিন এবং রাশিয়া উভয় দেশের অভিজ্ঞতাই নির্দেশ করছে যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে হটিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বাস্তবিকই খুব দুরূহ কাজ। আসলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা মূলধনের একটি বড় শক্তি হল অনুপ্রেরণার শক্তি (power of incentive)। সমাজতন্ত্রে এই অনুপ্রেরণা কাজ করে না। যে ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কাজে তেমন মনোযোগী নয়, সেই ব্যক্তিই তার নিজের কাজে অনেক বেশি উদ্যোগী ও উৎসাহী। সমাজতন্ত্রের উপরে ধনতন্ত্রের সাফল্য বা জোর বোধ হয় এই অনুপ্রেরণার অনুপস্থিতি বা উপস্থিতির মধ্যেই নিহিত আছে।

৪.৭ সারাংশ

১. ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে রিকার্ডোর (ক্লাসিক্যাল) তত্ত্ব (Ricardian or Classical Theory on Crisis in Capitalism) : ☐ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি মডেল প্রণয়ন করেছেন। এই মডেলে বলা হয়েছে যে, ধনতন্ত্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে জমিদার ও পুঁজিপতির ভূমিকা পরস্পরের বিপরীত। জমিদারেরা তাদের প্রাপ্ত খাজনা বা উদ্বৃত্ত অনুৎপাদনশীল ভোগে ব্যয় করে। পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত বা মুনাফা মূলধন গঠনে ব্যয় করে। এখন, জনসংখ্যা বাড়ার ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ার দরুন খাজনা বা জমিদারের আয় বাড়ে এবং পুঁজিপতির আয় বা মুনাফা কমে। জমিদারের আয় অনুৎপাদনশীল ভোগে ব্যয়িত হয়। রিকার্ডোর মতে, এর ফলে

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফার হার কমতে থাকে। অবশেষে এক সময় মুনাফার হার শূন্যে এসে পৌঁছায়। তখন মূলধন গঠন প্রক্রিয়া থেমে যায় এবং অর্থনীতিটি একটি নিশ্চল অবস্থায় (stationary state) পৌঁছায়। এভাবে রিকার্ডো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক নিরাশাজনক ভবিষ্যৎ দেখিয়েছেন।

২. ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে মার্ক্স-এর তত্ত্ব (Marxian Theory on Crisis in Capitalism) : ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে আমরা মার্ক্স-এর দু-রকমের তত্ত্ব পাই (ক) মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার দরুন সংকট এবং (খ) দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য তুলতে না-পারার সংকট। দ্বিতীয় ধরনের সংকটের আবার দুটি রূপ : (i) অসমানুপাতজনিত সংকট এবং (ii) ভোগঘাটতিজনিত সংকট।

৩. মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার দরুন সংকট (Crisis due to Falling Tendency of the Rate of Profit) : মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রে যতই মূলধন চয়ন এগিয়ে চলে, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বৃদ্ধির তুলনায় মূলধনের আঙ্গিক গঠন বৃদ্ধি পায়। ফলে মুনাফার হার কমার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। তখন পুঁজিপতি মূলধন গঠনে উৎসাহ পায় না। সে পুঁজি বা মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তুলে নেয়। ফলে ধনতন্ত্রে সংকট দেখা দেয়। মুনাফার হার কমার প্রবণতা দেখা দিলে পুঁজিপতি মোট মুনাফা বাড়াতে চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা উৎপাদন বাড়িয়ে চলে। ফলে বাজারে অধিক উৎপাদনের সংকট তৈরি হয়। এই সংকটকে বলা হয় মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁকের সঙ্গে জড়িত সংকট।

৪. অসমানুপাতজনিত সংকট (Disproportionality Crisis) : মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিকল্পনাহীনতা এবং নৈরাজ্যের জন্য এরূপ সংকটের উদ্ভব হয়। ধনতন্ত্রে প্রতিটি পুঁজিপতি অনিশ্চিত বাজারের জন্য উৎপাদন করে। এই বাজার সম্পর্কে তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। ফলে কখনও অতি বেশি উৎপাদন, কখনও অতি কম উৎপাদন হয়। ফলে কখনও দাম বেশি, কখনওবা দাম খুব কম হয়। যেখানে বেশি উৎপাদন হয়েছে, সেখানে উৎপাদন কমানো হয় এবং যেখানে উৎপাদন কম, সেখানে উৎপাদন বাড়ানো হয়। মনে হতে পারে যে, এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অবশেষে উৎপাদনের সঠিক অনুপাতগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে। সেটি হতে পারে যদি চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে। বাস্তবে এই অন্যান্য বিষয়গুলি সদা পরিবর্তনশীল। তার ফলে অসমানুপাতজনিত সংকট চলতে থাকে। এই সংকটের মূল কারণ হল ধনতন্ত্রে পরিকল্পনাহীনতা এবং নৈরাজ্য।

৫. ভোগঘাটতিজনিত সংকট (Underconsumption Crisis) : এই ঘাটতির পিছনে মূল কারণ হল জনগণের কম ভোগ ব্যয় এবং তার ফলে কার্যকরী চাহিদার স্বল্পতা। মার্ক্সের তত্ত্বে দেখা যায়, যতই উন্নয়নের ধারা এগিয়ে চলে, ততই সর্বহারা শ্রেণির দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। এর পিছনে কারণ হল পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকদের শোষণ। এর ফলে আয় বণ্টন শ্রমিকদের প্রতিকূলে এবং পুঁজিপতিদের অনুকূলে চলে যায়। এখন, শ্রমিকেরা তাদের আয়ের বড় অংশই ভোগ্য দ্রব্য কিনতে ব্যয় করে। অন্যদিকে, পুঁজিপতির আয়ের সামান্য অংশই হল ভোগ ব্যয়। সুতরাং আয় বণ্টন শ্রমিক বা সর্বহারার বিপক্ষে চলে গেলে মোট বা কার্যকরী চাহিদা কমে যায়। এর ফলে ধনতন্ত্রে সংকট ঘনীভূত হয়। এই ভোগঘাটতিজনিত সংকট তত্ত্ব

কেইন্‌স্‌-এর কার্যকরী চাহিদার অভাবের (lack of effective demand) তত্ত্বের খুবই কাছাকাছি।

৬. ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ (Break down of Capitalism and Transition to Socialism) : কার্ল মার্ক্স-এর মতে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নানা বিরোধ আছে। এই ব্যবস্থায় পুঁজি বা মূলধন শ্রমকে শোষণ করে অর্থাৎ পুঁজিপতি মূলধনের মালিকানার জোরে শ্রমিককে শোষণ করে। ফলে শ্রমিক মালিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ধনতন্ত্রে নানা ধরনের সংকটের উদ্ভব হয়। মূলধন চয়ন যত এগিয়ে চলে, মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা দেয়। আবার, ধনতন্ত্রে পরিকল্পনাহীনতার জন্য কোথাও বেশি উৎপাদন, আবার কোথাও কম উৎপাদন হয়। এর ফলেও সংকট ঘনীভূত হয়। আবার, ধনতন্ত্রে যতই মূলধন চয়নের ধারা এগিয়ে চলে, শ্রমিক শ্রেণির দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। আর এই শ্রমিক শ্রেণিই তাদের আয়ের বড় অংশ ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয় করে। ফলে ধনতন্ত্রে চাহিদার অভাবের সংকট দেখা দেয়। একে বলা হয় ভোগঘাটতিজনিত সংকট। মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রে এই সমস্ত নৈরাজ্যের ফলে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। অবশেষে, শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব বা শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। মূলধনের শ্রেণি-মালিকানা দূর হয় এবং সামাজিক মালিকানা প্রবর্তিত হয়। তখন আর শ্রম ও মূলধনের মধ্যে বিরোধ থাকে না। এভাবেই ধনতন্ত্রের অবসান হয়ে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে। এই নতুন ব্যবস্থায় আর শ্রমিক শোষিত হয় না। মূলধন ও শ্রমের মধ্যে বিরোধ বিলুপ্ত হয়।

৭. সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা : 1917 সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েকটি বছর ছিল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের বছর। এই অবস্থা দূর করার জন্য নয়া অর্থনৈতিক নীতি (1921-27) প্রবর্তিত হয়। এই অবস্থা ছিল আসলে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সহাবস্থান। 1928 সাল থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয়। তারপর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক উত্থান শুরু হয়। পরিকল্পনার যুগে সোভিয়েত উন্নয়নের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল : (i) অতি স্বল্পকালে শিল্পের দ্রুত উন্নতি, (ii) বিনিয়োগের দ্রুত বৃদ্ধি, (iii) কৃষি থেকে শিল্পে সম্পদের দ্রুত অপসরণ (shift), (iv) শ্রম নিয়োগের পরিমাণে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং এ সকলের পরিণামস্বরূপ জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি। এসবের ফলে অতি অল্প সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হয়।

কিন্তু 1950-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত উন্নয়নের কিছু ত্রুটি দেখা দিতে থাকে। সেগুলি হল : (i) শিল্প ক্ষেত্রের আয়তন বাড়ার ফলে তার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়া, (ii) ভোগ্য দ্রব্যের শিল্পের প্রতি অবহেলা (iii) কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা, (iv) দ্রব্যের পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গিয়ে গুণমান উপেক্ষা করা, (v) ভোগের এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকায় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি, (vi) পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে অতি কেন্দ্রিকতা (iii) প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রতা

প্রভৃতি। এসবের ফলে রুশ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য 1985 সালে মিথাইল গোর্বাচেভ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে পেরেস্ত্রৈকা (Perestroika : Restructuring অর্থাৎ পুনর্গঠন) এবং গ্লাসনস্ত (Glasnost : Openness অর্থাৎ মত প্রকাশের স্বাধীনতা) নামক দুটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু এতে সমস্যার কোনো সমাধান হল না, বরং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য আরো বেড়ে গেল। 1991 সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ল। যা একটি সময় ছিল একক দেশ, তা ভেঙে 15টি বিচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। সোভিয়েত রাশিয়া বিলুপ্ত হয়ে এখন শুধুই রাশিয়া আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে একটি সমাজতন্ত্রী দেশ হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে রয়ে গেল। সোভিয়েতের অন্যান্য সদস্য দেশগুলিতে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হল।

৮. সমাজতান্ত্রিক চিনের অভিজ্ঞতা (Experience of Socialist China) : 1949 সালের 21 সেপ্টেম্বর মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে চিনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই চিনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে চিন উন্নয়নের উচ্চ হার অর্জন করতে সক্ষম হয়। বর্তমান বিশ্বে চিন এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানব উন্নয়নসূচক, জনসাধারণের গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিতে চিনের সাফল্য ও কৃতিত্ব বেশ উজ্জ্বল। তবে চিনের এই অগ্রগতি সর্বদা মসৃণ পথে ঘটেনি। 1960-এর দশকে চিন যখন সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে সরে যাচ্ছিল, তখন মাও-সে-তুঙ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (1966-76) কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ও চিরাচরিত উপাদানগুলি দূর করা। এছাড়া এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত রকমের ধর্মবিশ্বাসকে উৎপাটন করা। বহু চার্চ লুণ্ঠিত হয়, ভেঙে দেওয়া হয় অথবা সেগুলিতে কারখানা অথবা মালের গুদাম খোলা হয়। বহু ব্যক্তি এই নিপীড়নে মারা যায়। তবে সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা এনেছিল মাও-য়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিরাট লাফ কর্মসূচি (1958-62)। চিনকে অতি দ্রুত শিল্পায়িত করা ছিল এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি চূড়ান্ত অবহেলিত হয়। বাড়ির লাগোয়া ফাঁকা জায়গায়ও কারখানা খোলা হয়। অনেক চাষি ক্ষোভে তাদের গবাদি পশু মেরে ফেলে। এই কর্মসূচির ফলে চিনে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষে প্রায় 3 কোটি লোক মারা যায়। অবশেষে, নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর 1978 সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে। সরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রও স্বীকৃতি লাভ করে। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের পথেই বর্তমানে চিন প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। তবে সমাজতান্ত্রিক চিনে রাজনৈতিক ক্ষমতা কমিউনিস্ট দলের হাতে। এই ক্ষমতার জোরে চিন শ্রমিকদের শোষণ করে চলেছে। মূলত এর ফলেই চিনের দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কম এবং সহজেই সেগুলি বিশ্ব বাজার দখল করেছে। সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক চিনের যে অভূতপূর্ব উন্নতি, তা কতটা সমাজতান্ত্রিক পথে, সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

৪.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. অর্থনীতির নিশ্চলাবস্থা বলতে কী বোঝেন?
২. নিশ্চলাবস্থার (stationary state) ধারণা প্রথম কে দিয়েছেন?
৩. মার্ক্সের তত্ত্বে শোষণের হার কাকে বলে?
৪. মার্ক্সের সংকট তত্ত্বে মূলধনের আঙ্গিক গঠন বলতে কী বোঝেন?
৫. মার্ক্সকে অনুসরণ করে মুনাফার হারের সংজ্ঞা দিন।
৬. অসমানুপাতজনিত সংকট কাকে বলে?
৭. ভোগঘাটতিজনিত সংকটের সংজ্ঞা দিন।
৮. রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কখন এবং কার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়?
৯. চিন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কখন এবং কার নেতৃত্বে ঘটেছিল?
১০. চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কার্যকাল এবং মূল কথা কী ছিল?
১১. বৃহৎ সম্মুখ-লাফ কর্মসূচি কে এবং কখন ঘোষণা করেন?
১২. চিনের বৃহৎ সম্মুখ লাফের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. ধনতন্ত্রে সংকট সম্পর্কে রিকার্ডোর ধারণাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
২. রিকার্ডোর উন্নয়ন তত্ত্বের অনুমানগুলি উল্লেখ করুন।
৩. রিকার্ডোর উন্নয়ন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি বিবৃত করুন।
৪. মার্ক্সকে অনুসরণ করে দেখান যে মূলধনের আঙ্গিক গঠন বাড়লে মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতা থাকবে।
৫. অসমানুপাতজনিত সংকটের ধারণাটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।
৬. ভোগঘাটতিজনিত সংকটের ধারণাটি সংক্ষেপে বলুন।
৭. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সোভিয়েত রাশিয়ার উন্নয়নের অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল?
৮. সমাজতান্ত্রিক চিনের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. উপযুক্ত অনুমানের সাহায্যে রিকার্ডো প্রণীত উন্নয়নের মডেলটি বর্ণনা করুন।
২. মার্ক্সের সংকট তত্ত্বে মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতার সঙ্গে জড়িত সংকটটি বিশ্লেষণ করুন।
৩. মার্ক্সকে অনুসরণ করে অসমানুপাতজনিত সংকট এবং ভোগঘাটতিজনিত সংকটের ধারণা গুছিয়ে বলুন।
৪. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, হরশংকর এবং বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জি (১৯৮৮) : সোভিয়েটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তারপর, ক্যালকাটা বুক হাউস

২. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্ত (২০০৭) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বুক সিন্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেড

৩. Desai, S.S.M. (1979) : Fundamentals of Economic Systems, Himalaya Publishing House

৪. https://en.m.wikipedia.org>wiki

৫. https://www.britannica.com>event

একক ৫ ❑ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ অনুন্নতির বিস্তার : ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্ব

৫.৩.১ ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্বের মূল্যায়ন

৫.৪ পল ব্যারন-এর নির্ভরশীলতা তত্ত্ব

৫.৪.১ ব্যারনের তত্ত্বের মূল্যায়ন

৫.৫ নির্ভরশীলতার তত্ত্ব হিসাবে ফ্রাঙ্ক এবং ব্যারনের তত্ত্বের তুলনা

৫.৬ ইমানুয়েলের অসম বিনিময় তত্ত্ব

৫.৭ বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা বা কে'র তত্ত্ব

৫.৭.১ কে'র তত্ত্বের মূল্যায়ন

৫.৮ সারাংশ

৫.৯ অনুশীলনী

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ❖ উপনিবেশবাদের সঙ্গে অনুন্নতির সম্পর্ক
- ❖ উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে অসম বিনিময়
- ❖ বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা
- ❖ ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে অনুন্নতির সম্পর্ক

৫.২ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় মূলত দু'ধরনের তত্ত্ব দেখা যায়। একটি হল চিরাচরিত (প্রাচীন) বা নয়া-প্রাচীন তত্ত্ব এবং অপরটি হল মার্ক্সীয় তত্ত্ব। চিরাচরিত তত্ত্বে বলা হয় যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের জোগানের পার্থক্যের দরুনই ঐ দেশগুলির মধ্যে উন্নয়নের স্তরে পার্থক্য বা ফারাক তৈরি হয়েছে। এধরনের তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে নার্কস্-এর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের তত্ত্ব, নেলসন্-এর নিম্ন আয়ের ভারসাম্য ফাঁদ, লাইবেনস্টাইন-এর ক্রমপুঞ্জিত কার্যকারণ তত্ত্ব প্রভৃতি। এই তত্ত্বগুলিকে একসঙ্গে অনুন্নতির ফাঁদ সংক্রান্ত তত্ত্ব (Trap theories) বলে অনেকে অভিহিত করতে চান। অধ্যাপক নার্কস্-এর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মূল বক্তব্য হল যে, কোনো দেশের দারিদ্র্য বা অনুন্নতির মূল কারণ হল মূলধনের স্বল্পতা। আবার, অধ্যাপক নেলসন্-এর মতে, জনসংখ্যার উচ্চহারে বৃদ্ধির ফলেই একটি অনুন্নত দেশ নিম্ন আয় স্তরের ফাঁদে আটকে যায়। আবার, লাইবেনস্টাইন্-এর মতে, স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির কারণ হল উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা দিতে না পারা। প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন রোজেনস্টাইন-রোডান। তাঁর মতে, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটা জোর ধাক্কা। যে দেশ এই জোর ধাক্কা দিতে ব্যর্থ, সেই দেশই অনুন্নত। এভাবে চিরাচরিত বা নয়া প্রাচীন তত্ত্বে কোনো দেশের অনুন্নতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই দেশের সম্পদ বা সামর্থ্যের অপ্রতুলতার দ্বারা।

অন্যদিকে, মার্ক্সীয় তত্ত্বে বা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুন্নতির কারণ হিসাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের প্রসারকেই দায়ী করা হয়। এই তত্ত্বের মূলকথা হল যে, উপনিবেশকারীরা তাদের উপনিবেশগুলিকে শোষণ করে, তাদের কাঁচামাল সস্তায় আত্মসাৎ করে এবং পুনরায় ঐ উপনিবেশে শিল্পজাত দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবে তারা উপনিবেশগুলির সম্পদ আহরণ করেছে, উপনিবেশগুলিকে তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সেই সম্পদের দ্বারা তারা নিজেরা উন্নত হয়েছে। সুতরাং, উপনিবেশবাদই হল একাধারে উন্নতি ও অনুন্নতির ফল। এই মার্ক্সীয় তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তারা হলেন ফ্রাঙ্ক, ব্যারন, ইমানুয়েল, কে প্রমুখ। ফ্রাঙ্ক বলেছেন, উন্নতি ও অনুন্নতি পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়নের পূর্বে পৃথিবীতে কোনো অনুন্নতি ছিল না। উন্নয়নের ন্যায় অনুন্নতিও একটি প্রক্রিয়া। তাঁর মতে, বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে পৃথিবীর এক অংশে উন্নতি ও অপর অংশে অনুন্নতি ঘটেছে। সংক্ষেপে, বর্তমান অনুন্নত দেশগুলি আসলে উন্নত দেশগুলির ঔপনিবেশিক শোষণের ফল। প্রায় একই মত পোষণ করেন অধ্যাপক পল ব্যারন। তাঁর নির্ভরশীলতা তত্ত্বে তিনি বলেছেন যে, উপনিবেশগুলি নানাভাবে তাদের শাসক দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে শাসক দেশগুলি উপনিবেশগুলির উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। আর তার জন্যই একদিকে উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতি ঘটেছে এবং একই সময়ে উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নয়ন ঘটেছে। ইমানুয়েল তাঁর অসম বিনিময় তত্ত্বে বলেছেন যে, উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সময় অসম বিনিময় ঘটে। এই অসম বিনিময়কেই তিনি উন্নয়ন স্তরের পার্থক্যের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বলে মনে

করেন। অধ্যাপক জিওফ্রে কে মনে করেন যে, উন্নত দেশের বাণিজ্যিক মূলধনের বিশেষ ভূমিকাই স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির জন্য দায়ী। তাঁর মতে, বাণিজ্যিক মূলধন কোনো মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না। ইহা শুধু বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে মুনাফা অর্জন করে। কে-র মতে, উন্নত দেশের বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে বা উপনিবেশে এসে উন্নত দেশের শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে। এই মূলধন শিল্প মূলধনের জন্য উপনিবেশ থেকে সস্তায় কাঁচামাল কিনেছে এবং আবার ঐ শিল্প মূলধনের তৈরি দ্রব্য বেশি দামে উপনিবেশগুলিতে বিক্রি করেছে। এভাবে বাণিজ্য মূলধন উন্নত দেশের উপনিবেশগুলিতে শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে। কে-র মতে, ঔপনিবেশিক যুগে উন্নত দেশ থেকে আগত বাণিজ্যিক মূলধনের এই ভূমিকাই ঔপনিবেশগুলির অনুন্নতির জন্য দায়ী।

অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে এই মার্ক্সীয় তত্ত্বগুলিকে একসাথে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (dependency theory) বলে অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের অবস্থা উন্নত দেশের উন্নয়ন ও প্রসারের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তারা হলেন Andre Frank, Paul Baran, Arghiri Emmanuel, Geoffrey Kay, Samir Amin, Dos Santos, Yves Lacoste এবং আরও অনেকে। সংক্ষেপে এঁদের তত্ত্বের বক্তব্য হল, উন্নত দেশের উপর স্বল্পোন্নত দেশের নির্ভরশীলতাই ঐ সমস্ত দেশের অনুন্নতির মূল কারণ। বর্তমান এককে আমরা ফ্রাঙ্ক, ব্যারন, ইমানুয়েল এবং কে-র তত্ত্ব আলোচনা করব।

৫.৩ অনুন্নতির বিস্তার : ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্ব

A. G. Frank তাঁর On Capitalist Underdevelopment (1971) নামক বইয়ে কোনো দেশের অনুন্নতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি অনুন্নতির কারণ হিসাবে উপনিবেশবাদের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফ্রাঙ্ক-এর পূর্বে Lacoste অনুরূপ কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, অনুন্নত দেশের সমস্যা অনুধাবন করতে হলে বৈদেশিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে হবে না। তিনি বলেছেন, অনুন্নত দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলেই অনুন্নতির উদ্ভব ঘটেছে। Lacoste উপনিবেশবাদকে অনুন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করেন, যদিও এটাই অনুন্নতির একমাত্র কারণ নয়। ফ্রাঙ্কও Lacoste-এর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনিও মনে করেন যে, অনুন্নতির উৎপত্তি ও বিস্তারের পিছনে উপনিবেশবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফ্রাঙ্ক-এর মতে, বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ারই দুটি দিক হল অর্থনৈতিক উন্নতি ও অনুন্নতি। উপনিবেশকারী দেশগুলি (colonisers) উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ নিঃসরণ করেছে এবং তার ফলে ঐ উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হারিয়েছে। আর এই জন্যই উপনিবেশগুলি অনুন্নতই রয়ে গেছে। একইসঙ্গে, উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশগুলিতে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত বেড়েছে। ঐ উদ্বৃত্ত ঐ সমস্ত দেশের মূলধন গঠন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য

করেছে। সুতরাং, বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের দুটি ফল হল উন্নতি এবং অনুন্নতি। তাঁর মতে, বিশ্বে কিছু অংশের উন্নত হওয়ার অর্থই হল বিশ্বের কিছু অংশ অনুন্নত।

ফ্রাঙ্ক বলেছেন, যখন বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনো উন্নয়ন ঘটেনি, তখন অনুন্নতি বলেও কিছু ছিল না। যখন থেকে বিশ্বের কিছু কিছু অংশে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটতে লাগলো, তখনই কিছু কিছু অংশে অনুন্নতি শুরু হল। তাঁর তত্ত্বে, উন্নতি এবং অনুন্নতি ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের সাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নানা সংঘাত থাকে। শোষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদিই হল এর ভিত্তি। ফ্রাঙ্ক মনে করেন যে, ধনতন্ত্রের এই সংঘাতপূর্ণ উন্নয়নের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে উন্নতি এবং অনুন্নতি।

ফ্রাঙ্ক বলেছেন যে, অনুন্নতির অর্থ নিছক উন্নতির অভাব নয়। উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েই রীতিবদ্ধভাবে এবং সর্বত্র উপনিবেশবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুত ফ্রাঙ্কের মতে, এরা উপনিবেশবাদেরই ফল। উপনিবেশবাদের মধ্যে রয়েছে এক পক্ষের আধিপত্য এবং অন্যপক্ষের বশ্যতা বা অধীনতা, একপক্ষের দ্বারা অন্য পক্ষের শোষণ। এর জন্যই বিশ্ব ইতিহাসে একসময় উপনিবেশ থাকা দেশগুলি বর্তমানে অনুন্নত দেশ বলে পরিগণিত। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশই বর্তমানে অনুন্নত। আর এরা কোনো না কোনো বর্তমান উন্নত দেশের উপনিবেশ ছিল। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রমী দেশ হল জাপান। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানই প্রথম উন্নত হয়। এক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কের যুক্তি হল যে, জাপান কখনোই সেই অর্থে উপনিবেশ ছিল না অর্থাৎ উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রে শোষক ও শোষিতের যে সম্পর্ক, তা জাপানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। জাপানে বিদেশি শাসক শ্রেণি দেশটির উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই শাসক শ্রেণি কোনো বৈদেশিক বিনিয়োগ বা সাহায্য ছাড়াই জাপানের শিল্পোন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে উপনবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, তার মধ্যে জাপানকে পড়তে হয়নি বলে ফ্রাঙ্ক মনে করেন। উপনিবেশবাদের কুফল তাই জাপানকে ভোগ করতে হয়নি। সেজন্যই এশিয়ার অন্য দেশগুলির তুলনায় জাপান অনেক বেশি উন্নত হতে পেরেছে বলে ফ্রাঙ্কের অভিমত। সুতরাং, জাপানের ব্যাপারটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা যা বরং উপনিবেশবাদ এবং অনুন্নতির তত্ত্বকেই আরো জোরালো করে বলে ফ্রাঙ্ক মনে করেন।

ফ্রাঙ্ক জোর দিয়ে বলেছেন যে, উপনিবেশ দেশ মানেই সেই দেশটি অনুন্নত, আর উপনিবেশ না হলে অথবা উপনিবেশকারী দেশ হলে সেই দেশটি উন্নত অর্থাৎ অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ একে অপরের সঙ্গে উভয় দিক থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফ্রাঙ্ক দাবি করেছেন যে, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ এই মতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক কোনো দেশের অধীনে 'অর্থনৈতিক' উপনিবেশ হয়ে থাকলে ঐ উপনিবেশ দেশটি অনুন্নত থেকে যায়। তাই ফ্রাঙ্ক মন্তব্য করেছেন যে, অনুন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি উভয়েই এক বিশ্বব্যাপী পরস্পর সংযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল, আর সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি হল

ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথেই বিশ্বে উন্নতি ও অনুন্নতি একইসঙ্গে দেখা দিতে থাকে। এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে বলে ফ্রাঙ্ক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আমরা জানি, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বাণিজ্যবাদের প্রসারের সাথে সাথে ধনতন্ত্রের উন্মেষ ঘটতে থাকে। এই ব্যবস্থার উৎসস্থলে আছে কিছু দেশ যাদের উন্নতি ঘটতে থাকে। এদের বলা হয় কেন্দ্র (centre) বা metropole। আর এই কেন্দ্রের বলয়ে আছে কিছু দেশ যাদের বলা হয় প্রান্ত বা periphery। এদের metropole-satellite তত্ত্বও বলা যেতে পারে। কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে বাণিজ্য বা বিনিময়ের সম্পর্ক এমন যে, এই সম্পর্ক কেন্দ্র বা metropole-এর উন্নতি এবং প্রান্ত বা satellite-এর অনুন্নতি ঘটায়। দুটি প্রক্রিয়া একইসঙ্গে চলতে থাকে অর্থাৎ উন্নতি এবং অবনতি একই প্রক্রিয়ারই অংশ। ফ্রাঙ্কের মতে, ধনতান্ত্রিক বিশ্বে উন্নতির বিস্তার এবং অ-ধনতান্ত্রিক অংশে অনুন্নতির বিস্তার (development of the development and development of the underdevelopment) উভয় প্রক্রিয়াই আন্তর্জাতিক স্তরে এবং বিভিন্ন জাতীয় স্তরে চলতে থাকে। তাঁর দাবি, এই অনুন্নতি থেকে মুক্তির উপায় হল দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। যে সমস্ত দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, সেই সমস্ত দেশই ধনতন্ত্রের শোষণ অর্থাৎ কেন্দ্র দ্বারা প্রান্তীয় দেশের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। সুতরাং, ফ্রাঙ্কের মতে, ধনতান্ত্রিক শোষণ তথা অনুন্নতির অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। তাঁর ভাষায়, "The only way out of underdevelopment is the way out of the capitalist system".

৫.৩.১ ফ্রাঙ্কের তত্ত্বের মূল্যায়ন

অনেক অর্থনীতিবিদ ফ্রাঙ্কের তত্ত্বের নানা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেছেন। আমরা কয়েকটি সীমাবদ্ধতা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, ফ্রাঙ্কের তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বে অনুন্নতি বলে কিছু ছিল না। এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। মোটামুটিভাবে বলা হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে বাণিজ্যবাদের ধারণার প্রসারের সময় থেকেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু। সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ খুবই অনুন্নত ছিল।

দ্বিতীয়ত, অনুন্নতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। বাণিজ্য মূলধনই যেন উপনিবেশ থেকে সম্পদ আহরণের বা শোষণের চাকা (Wheels of exploitation) হিসাবে কাজ করেছে। অনেকে মনে করেন যে, অনুন্নতির এই ব্যাখ্যায় দ্রব্যের বিনিময় সম্পর্কের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনুন্নতির পিছনে শিল্প মূলধনেরও (industrial capital) যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শুধুমাত্র বাণিজ্য মূলধনের বিশেষ ভূমিকার দ্বারা অনুন্নতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ফ্রাঙ্কের তত্ত্ব একপেশে (lop-sided)।

তৃতীয়ত, ফ্রাঙ্কের তত্ত্বে দাবি করা হয়েছে যে, উপনিবেশবাদ এবং অনুন্নতি পরস্পরের সঙ্গে উভয় দিক থেকেই সম্পর্কযুক্ত। এর অর্থ হল, কোনো দেশ উপনিবেশ হওয়ার ফলে অনুন্নত। আবার, উপনিবেশ না হলে অথবা উপনিবেশকারী দেশ হলে সেই দেশ পরে উন্নত। কিন্তু সুইডেন ও নরওয়ে কোনো উপনিবেশকারী দেশ ছিল না। তাদের কোনো উপনিবেশ ছিল না। কিন্তু তারা বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম সারির উন্নত দেশ।

চতুর্থত ঐ, ফ্রাঙ্ক দাবি করেছেন যে, অনুন্নতি থেকে মুক্তি পাওয়ার 'একমাত্র' উপায় হল ধনতন্ত্রের পথ থেকে সরে গিয়ে অথবা ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। মার্ক্স দেখিয়েছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার নানা বিরোধ এবং সংঘাত থাকে। সেই সংঘাত দূর করতে হলে সশস্ত্র শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তখন আর মূলধনের সামাজিক মালিকানা থাকবে না, মূলধন বা উৎপাদনের মাধ্যমের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে মূলধনের শোষণমূলক চরিত্র থাকবে না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিরোধ বা সংঘাত দূর হবে। মার্ক্স-এর পথ অনুসরণ করে এক সময় রাশিয়া ও চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 1980-র দশকে সোভিয়েত রাশিয়ায় নানা সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয় এবং সেখানে উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্র টেকেনি। সোভিয়েতের পতন ঘটে এবং সোভিয়েত রাশিয়া বলে যা একটি দেশ হিসাবে বিপ্লবের পর একত্রিত হয়েছিল, তা ভেঙে 15টি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। আর আজকের সমাজতন্ত্রী চিন তার সমাজতন্ত্রের পথ থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। বর্তমানে চিনকে অনেকে মিশ্র অর্থনীতি (অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সরকারি ক্ষেত্রের সহাবস্থান) বলে মনে করেন। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। কিউবা, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া এরূপ কয়েকটি ছোটো দেশেই এখনও সমাজতন্ত্র টিকে আছে। বরং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তার নানা অভ্যন্তরীণ সংকট বা সংঘাত সত্ত্বেও টিকে আছে।

পঞ্চমত, ফ্রাঙ্ক কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কের কথা বলেছেন 1971 সালে প্রকাশিত তাঁর On Capitalist Underdevelopment বইয়ে। কিন্তু তার পূর্বে 1940-এর দশকের শেষভাগে রাউল প্রেবিশ এবং হ্যান্স সিঙ্গার পৃথকভাবে প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, শিল্পপ্রধান উন্নত দেশের সঙ্গে কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশের অবাধ বাণিজ্য হলে অনুন্নত দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিল্পোন্নত দেশটি লাভবান হয়। তাছাড়া, বাণিজ্য হার (terms of trade) অনুন্নত দেশের বিপক্ষে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে অনুন্নত দেশটি লাভবান হতে পারে না। তাঁদের এই মতকে একসঙ্গে প্রেবিশ-সিঙ্গার তত্ত্ব (Prebisch-Singer thesis) বলা হয়। ফ্রাঙ্ক এই তত্ত্বের সঙ্গে উপনিবেশবাদের উপাদানটুকু যোগ করেছেন। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য এখন উন্নত বা উপনিবেশকারী দেশটির আরো অনুকূলে এবং উপনিবেশ দেশটির প্রতিকূলে চলে যায়। এক কথায়, বৈদেশিক বাণিজ্য উপনিবেশ দেশটির কাছে শোষণমূলক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনুন্নত বা উপনিবেশ দেশটি শোষিত হয়। এভাবে দেখলে ফ্রাঙ্কের তত্ত্বটিকে বড়জোর প্রেবিশ-সিঙ্গার

তত্ত্বের পরিবর্ধন (extension) বলে ভাবা যেতে পারে।

ষষ্ঠত, অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে ফ্রাঙ্কের এই মার্ক্সীয় তত্ত্ব বা নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে অনকেই তত্ত্ব বলতে নারাজ। অনুন্নতি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কের আলোচনা বিশ্লেষণধর্মী নয়। এখানে তিনি নিজের কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বিবৃতির আকারে পেশ করেছেন। সেগুলিকে তিনি যুক্তি ও বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত করার কোনো চেষ্টা করেননি। তাই ফ্রাঙ্কের আলোচনাকে অনেকের তত্ত্ব বলে মেনে নিতে আপত্তি।

৫.৪ পল ব্যারন-এর নির্ভরশীলতা তত্ত্ব

পল ব্যারন অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। এই তত্ত্বকে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব-ও বলা হয়। অধ্যাপক ব্যারন-এর মতে, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েরই পিছনে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এবং সেই উদ্বৃত্ত যথাযথ ব্যবহারের (Proper utilisation) বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি বলেছেন যে, ঐতিহাসিকভাবে যে দেশগুলি একসময় উপনিবেশ ছিল, সেই উপনিবেশ থাকা কালে তারা তাদের শাসক দেশগুলির (colonisers) উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। এই নির্ভরশীলতার কারণে শাসক দেশগুলি উপনিবেশগুলির উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। এভাবে উপনিবেশগুলি তাদের নিজেদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্যারন মনে করেন যে, এই জন্যই একদিকে উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতি ঘটেছে এবং অন্যদিকে একই সময়ে উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নতি ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে অনুন্নতিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে একে অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব (neo-Marxian theory) বলা হয়। এই তত্ত্বের মূল কথা হল, ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এভাবে এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ব অর্থনীতির এক অংশে ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং উন্নতির ফলেই অপর অংশে অর্থনৈতিক অনুন্নতি ঘটেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই তত্ত্বটিকে নির্ভরশীলতা তত্ত্বও (dependency theory) বলা হয়। এই ধরনের তত্ত্বকে কেন নির্ভরশীলতা হল বলা হয় তা সংক্ষেপে বোঝানো যেতে পারে। নির্ভরশীলতা হল এমন এক অবস্থা যখন কোনো দেশের অর্থনীতি অপর দেশের অধীন এবং ঐ অপর দেশের উন্নয়ন ও বিকাশের দ্বারা এই দেশটির উন্নয়ন সীমায়িত। ঐ দেশটির উন্নয়ন উন্নত দেশটির উন্নয়নের শর্তাধীন (conditioned)। যখন কিছু দেশের উন্নয়ন স্বয়ংচালিতভাবে ঘটে থাকে, আর সেই উন্নয়নের কিছু সদর্থক বা নঞর্থক প্রভাব অপর দেশের উপর পড়ে, তখন আমরা এই দ্বিতীয় দলের দেশগুলিকে প্রথম দলের দেশগুলির উপর নির্ভরশীল বলতে পারি। পল ব্যারনের তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, উপনিবেশকারী দেশগুলির উন্নয়ন ও বিস্তারের উপর ঐ দেশগুলির উপনিবেশগুলির উন্নয়ন নির্ভর করে। এজন্যই ব্যারনের তত্ত্ব এবং এই জাতীয় তত্ত্বগুলিকে একযোগে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বলা হয়।

এখন, ব্যারনের তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর সুবিখ্যাত "The Political Economy of Growth" (1957) নামক বইয়ে তাঁর নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূল কথাগুলি বলা আছে।

ব্যারন তাঁর তত্ত্বে সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের (potential economic surplus) ধারণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত ব্যবহৃত না হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিভিন্ন রূপে বিরাজ করে তাকে সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বলে। ব্যারনের মতে, কোনো অর্থনীতিতে একচেটিয়া কাঠামো বজায় থাকলে ঐ অর্থনীতির বিনিয়োগযোগ্য সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সমাজের উন্নয়নের জন্য পাওয়া যায় না। সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত না হয়ে বরং অপচয় হয়। ব্যারনের মতে, সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত চারটি আকারে দেখা দিতে পারে— (i) উদ্বৃত্ত ভোগ অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ, (ii) অনুৎপাদনশীল শ্রমিক অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকার শ্রমিক এবং মরশুমি বেকার, (iii) অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ, যেমন, বিজ্ঞাপন, ফাশন শো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে ব্যয় এবং (iv) বাণিজ্যচক্রের ওঠানামাজনিত বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের ফলে সৃষ্ট বেকারি। ব্যারন বলেছেন যে, অনুন্নত দেশে প্রধানত এই চার রকম আকারে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সুপ্ত থাকতে পারে। সুতরাং, এই সকল দেশে স্বল্প উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্তের অভাবের সমস্যা নয়, সমস্যা হল ঐ উদ্বৃত্তের উপযুক্ত ব্যবহারের। ব্যারন মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশে এই সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অনুৎপাদনশীল ভোগে নষ্ট হয়েছে; রাজা-মহারাজাদের আড়ম্বরপূর্ণ ভোগে এবং বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়েছে; যুদ্ধ বিগ্রহে অথবা মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দুর্গ আর সমাধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে বিশ্ব-অর্থনীতিতে তখন উপনিবেশকারী দেশগুলিতে বাণিজ্য মূলধন ও শিল্প মূলধনের বিকাশ ঘটছিল। সেই মূলধনের দ্বারা উন্নত প্রভু-দেশগুলি বা উপনিবেশকারী দেশগুলি (mother countries বা colonisers) স্বল্পোন্নত দেশের এই উদ্বৃত্ত নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উপনিবেশকারী দেশগুলি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই উদ্বৃত্ত নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। সেখানে তারা এই উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে। ফলে তাদের নিজেদের দেশে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া দ্রুত, মসৃণ এবং সহজ হয়েছিল। একই সঙ্গে, উপনিবেশগুলি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হল। ফলে তাদের মূলধন-গঠন প্রক্রিয়া রুদ্ধ হল। তারা অনুন্নতই রয়ে গেল। এভাবে ব্যারন দেখিয়েছেন যে, স্বল্পোন্নত দেশের উদ্বৃত্ত দু-দিকে ধারালো ক্ষুরের (two-edged razor) ন্যায় কাজ করেছে। উপনিবেশবাদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে আহরণ করা এই উদ্বৃত্ত উপনিবেশকারী দেশের উন্নতি ঘটিয়েছে এবং উপনিবেশগুলিকে অনুন্নত রেখে দিয়েছে। এইভাবে ঔপনিবেশিক নির্ভরশীলতা একই সঙ্গে উন্নতি ও অনুন্নতির সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে এটাই হল পল ব্যারনের নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূলকথা।

৫.৪.১ পল ব্যারনের তত্ত্বের মূল্যায়ন

ব্যারনের নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। **প্রথমত,** উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে প্রথমে বাণিজ্য মূলধন এসেছিল। এই বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশের উদ্বৃত্ত আহরণ করে নিজের দেশে প্রেরণ করেছিল। এখন, অনুন্নত দেশে শ্রম ও কাঁচামাল সস্তা। তাই উন্নত দেশ থেকে

একচেটিয়া মূলধন অনুন্নত দেশে এসেছিল। তাহলে ঐ উদ্বৃত্ত অনুন্নত দেশেই বিনিয়োজিত হয়নি কেন? ব্যারন এই প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা দেননি। অধ্যাপক কে-র তত্ত্বে এই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর মেলে। সেখানে তিনি বলেছেন যে, উন্নত দেশের বাণিজ্য মূলধন প্রকৃতপক্ষে শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি (agent) রূপে কাজ করেছিল। **দ্বিতীয়ত,** মার্ক্স-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে ব্যারন দুটি দেশের মধ্যে শোষণকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মার্ক্স-এর তত্ত্বে এক শ্রেণির (পুঁজিপতি) দ্বারা অপর এক শ্রেণির (শ্রমিক) শোষণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে শোষণ দুটি শ্রেণির মধ্যে প্রযোজ্য। এই শোষণ তত্ত্ব দুটি দেশের মধ্যে শোষণ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক কি না, সে সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যারনের তত্ত্বের বাস্তব তথ্যের সমর্থনকে অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বের অনেক দেশেরই অনুন্নতির পিছনে ঔপনিবেশিক শোষণের একটা বড় ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারত থেকে সম্পদ লুট করে এবং নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে ব্রিটেন ভারতের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করেছিল। ভারত তার নিজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ফলে একদিকে ভারতে শিল্পায়ন বা অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলো না। অন্যদিকে, এই উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবে সাহায্য করেছিল। আরো অনেক বর্তমান অনুন্নত দেশের অভিজ্ঞতাও একই রকমের। ঔপনিবেশিক যুগে এই দেশগুলি তাদের প্রভু-দেশগুলির (colonisers) দ্বারা শোষিত হয়েছে, উদ্বৃত্ত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে এবং ফলত শিল্পায়ন ঘটেনি এই সমস্ত দেশে। পাশাপাশি, তাদের প্রভু দেশগুলিতে শিল্পায়ন ও উন্নতি ঘটেছে।

তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতসহ এই সমস্ত উপনিবেশ দেশের অনুন্নতির পিছনে এই ঔপনিবেশিক শোষণ অন্যতম প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব বা নির্ভরশীলতা তত্ত্ব কিছুটা একপেশে (One-sided বা lop-sided)। ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাকে ভারত থেকে আহরিত সম্পদ উৎপাদনশীলভাবে এবং দক্ষভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল। ব্রিটেনে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং তুলাবস্ত্র শিল্পে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার না ঘটলে সেখানে পৃথিবীর প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটতো না। বিশ্বের ইতিহাসে স্পেন এবং পোর্তুগালও ছিল প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশগুলির অন্যতম। তাদেরও ছিল উপনিবেশ থেকে আহরণ করা বিপুল উদ্বৃত্ত। কিন্তু উদ্বৃত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত কৌশল তাদের জানা ছিল না। ফলে পৃথিবীর বুকে প্রথম শিল্প বিপ্লব গ্রেট ব্রিটেনেই সংঘটিত হয়। তাই বলা যায় যে, ব্যারনের তত্ত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি।

৫.৫ নির্ভরশীলতার তত্ত্ব হিসাবে ফ্রাঙ্ক ও ব্যারনের তত্ত্বের তুলনা

এ. জি. ফ্রাঙ্ক এবং পল ব্যারন উভয়েই অনুন্নতির মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ উভয়েই স্বল্পোন্নত

দেশের অনুন্নতিকে তাদের শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। উভয় তত্ত্বই নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অংশ। এক্ষেত্রে নির্ভরশীলতার অর্থ হল এক বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে কোনো দেশের অর্থনীতি অপর কোনো দেশের উন্নয়ন ও প্রসারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফ্রাঙ্ক এবং ব্যারনের তত্ত্বের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। আবার, তাঁদের তত্ত্বের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। উভয় তত্ত্বের মধ্যে তুলনা করার জন্য আমরা তত্ত্ব দুটি একে একে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

☐ **অনুন্নতি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কের তত্ত্বের মূলকথা :** ফ্রাঙ্ক-এর মতে, উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েই রীতিবদ্ধভাবে এবং সর্বত্র উপনিবেশবাদের সহিত জড়িত। তাঁর মতে, এরা উপনিবেশবাদেরই ফল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলতে কতকগুলি সম্পর্ককে বোঝায় যার মধ্যে আধিপত্য, অধীনতা বা বশ্যতা এবং শোষণের মুখ্য ভূমিকা থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বর্তমান অনুন্নত দেশগুলি আজকের কোনো না কোনো উন্নত দেশের উপনিবেশ ছিল।

এভাবে ফ্রাঙ্ক দাবি করেছেন যে, অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বাণিজ্যবাদের প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী এক পরস্পর সংযুক্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এর ফলে কেন্দ্র বা metropole-এর দেশগুলির (পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা) উন্নতি ঘটে। কেন্দ্র তার প্রান্তীয় (periphery/satellite) দেশগুলিকে (এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকা) শোষণ করে। এই শোষণের পদ্ধতি এমন যে, কেন্দ্রস্থিত দেশগুলির উন্নতি ঘটে এবং প্রান্তীয় দেশগুলির অনুন্নতি ঘটে। এভাবে উন্নতি এবং অনুন্নতি একই প্রক্রিয়ার ফল। ফ্রাঙ্ক-এর মতে, অনুন্নতি থেকে রেহাই পেতে গেলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংক্ষেপে এই হল ফ্রাঙ্ক-এর উপনিবেশবাদের তত্ত্ব।

☐ **পল ব্যারন-এর অনুন্নতি তত্ত্বের মূলকথা :** পল ব্যারন-এর মতে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অনুন্নতি উভয়েরই পিছনে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এবং তা ব্যবহারের বড় ভূমিকা আছে। তিনি বলেছেন যে, উপনিবেশ দেশগুলি তাদের শাসক দেশগুলির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শাসক দেশগুলি উপনিবেশ দেশগুলির উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল, তাও উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়নি। নানা অনুৎপাদনশীল ভোগে তা নষ্ট হয়েছে। ফলে একদিকে উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতি ঘটেছে এবং অন্যদিকে একই সময়ে উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নয়ন ঘটেছে। এই ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এভাবে ব্যারন দেখিয়েছেন যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অংশে ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং উন্নতির ফলেই অপর অংশে অর্থনৈতিক অনুন্নতি ঘটেছে। সংক্ষেপে এই হল ব্যারন-এর তত্ত্বের মূলকথা।

এখন, ফ্রাঙ্কের তত্ত্ব এবং ব্যারনের তত্ত্বের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে। উভয় তত্ত্বের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য বা মিল আছে। **প্রথমত,** উভয় তত্ত্বই ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে অনুন্নতিকে ব্যাখ্যা করেছে।

দ্বিতীয়ত, উভয় তত্ত্বেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়েছে। **তৃতীয়ত,** অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া এখানে বিবেচিত হয়নি। **চতুর্থত,** উভয় তত্ত্বই অনুন্নতির ব্যাখ্যায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিবেচনা করেনি। তারা এক্ষেত্রে মূলত বাহ্যিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। **পঞ্চমত,** উভয় তত্ত্বই নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো সুপারিশ (policy prescriptions) করতে পারে না কেননা উভয়েই অনুন্নতির ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর নির্ভর করেছে; বর্তমান বিষয়ের উপর নয়। তবে দুটি তত্ত্বের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। **প্রথমত,** ফ্রাঙ্কের তত্ত্ব বিশ্লেষণধর্মী (analytical) নয়, কিন্তু ব্যারনের তত্ত্ব বিশ্লেষণধর্মী। **দ্বিতীয়ত,** অনুন্নতি এড়াতে ফ্রাঙ্ক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব অথনীতিতে সমাজতন্ত্র ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে, অনেক দেশে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। ব্যারন অবশ্য এ ধরনের কোনো সুপারিশ করেননি। **তৃতীয়ত,** ব্যারন তার তত্ত্বে 'সুপ্ত' অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ধারণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর যুক্তি, এই সুপ্ত সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত নিষ্কাশন (extraction) এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহার (utilisation) করতে হবে। তবেই উন্নয়ন ঘটবে। ঔপনিবেশিক যুগে তা সম্ভব হয়নি। ফ্রাঙ্কের তত্ত্বে এরূপ সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। **চতুর্থত,** ফ্রাঙ্কের তত্ত্ব নির্দেশ করে যে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বে বিশ্বে অনুন্নতি ছিল না। এই তত্ত্ব ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না। ব্যারন-এর তত্ত্বে অবশ্য এ রকম কোনো মন্তব্য নেই।

এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বলা যায় যে, নির্ভরশীলতা (dependency) তত্ত্ব হিসাবে ব্যারন-এর তত্ত্ব ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নততর।

৫.৬ ইমানুয়েল-এর অসম বিনিময় তত্ত্ব

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন Arghiri Emmanuel। নির্ভরশীলতা হল এমন এক অবস্থা যখন কোনো দেশের অর্থনীতি অপর দেশের অধীন এবং ঐ অপর দেশের উন্নয়ন ও বিস্তারের উপর ঐ দেশটির উন্নয়ন নির্ভরশীল হয়। এরূপ নির্ভরশীলতা তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তা অর্থনৈতিক অনুন্নতিকে অসম বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ইমানুয়েল। তাঁর মতে, উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সময় অসম বিনিময় ঘটে। এই অসম বিনিময়কেই তিনি উন্নয়নের পার্থক্যের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, অসম বিনিময় অনুন্নতির 'সম্পূর্ণ' ব্যাখ্যা নয়, তবে এটাই তাঁর মতে প্রাথমিক কারণ। তাঁর মতে, এই অসম বিনিময়ের দ্বারাই অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে সম্পদের স্থানান্তর ঘটেছে।

ইমানুয়েল অসম বিনিময়কে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্ক্সের মূল্যের শ্রম তত্ত্ব (labour theory of value) ব্যবহার করেছেন। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোয় মার্ক্সের শ্রম তত্ত্বের পরিবর্ধন ঘটিয়ে তার উপর ইমানুয়েল তাঁর অসম বিনিময় তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে

উৎপাদন কৌশল ও মজুরিতে পার্থক্যের দরুন তাদের মধ্যে বাণিজ্য চলাকালীন অসম বিনিময় ঘটে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশে শ্রম সস্তা, সেখানে শ্রমের মজুরি কম। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তথা দাম সেখানে কম। অন্যদিকে, উন্নত দেশে শ্রমের জোগান তুলনায় কম বলে মজুরির হার বেশি। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তথা দাম বেশি। এভাবে উন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে সেই বাণিজ্যে অসম বিনিময় ঘটে। এর তাৎপর্য হল, উন্নত দেশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি দ্রব্য পেতে স্বল্পোন্নত দেশকে বেশি পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করতে হয়।

এই অসম বিনিময়ের তত্ত্বের দ্বারা ইমানুয়েল তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, অসম বিনিময়ের ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির দ্বারা শোষিত হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাদের দ্রব্যসামগ্রী মূল্যের (value) কম দামে বিক্রি করে এবং উন্নত দেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী মূল্যের বেশি দামে ক্রয় করে। এই তত্ত্বের আর একটি সিদ্ধান্ত হল যে, স্বল্পোন্নত দেশের জনগণকে শোষণের দ্বারা উন্নত দেশের শ্রমিকেরা লাভবান হয়। এই শোষণের ফলেই অনুন্নত দেশটি অনুন্নতই থেকে যায়, এবং উন্নত দেশটি আরো উন্নত হতে থাকে।

ইমানুয়েল এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের অসমতা বা পার্থক্যকে (unevenness of development) ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক আমিনের মতো তিনিও মনে করেন যে, উন্নত বা কেন্দ্রের দেশ এবং প্রান্তের বা অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অসম বিনিময়ের কারণ হল তাদের মজুরিতে পার্থক্য। কেন্দ্রের দেশগুলিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি বলে মজুরি বেশি। তেমনি, প্রান্তের দেশগুলিতে শ্রমিকের কম উৎপাদনশীলতার দরুন মজুরি কম। এখন, প্রান্তের দেশগুলিতে মজুরি কম হওয়ার দরুন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বেশি। ফলে কেন্দ্রস্থিত দেশগুলির পুঁজিপতিরা এখানে উৎপাদন ও রপ্তানি করতে আগ্রহী হয়। এভাবে তারা স্বল্পোন্নত দেশের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ঐ উদ্বৃত্ত মূল্য অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাওয়া যায় না। অনুন্নত দেশটি অনুন্নতই রয়ে যায়। অধ্যাপক আমিনও একই মত ব্যক্ত করেছেন।

মূল্যায়ন (Evaluation) : অসম উন্নয়ন তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান সমালোচনা করা হয়। **প্রথমত,** ইমানুয়েল প্রধানত মার্ক্সের শোষণ তত্ত্ব প্রয়োগ করে উন্নতি ও অনুন্নতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন, মার্ক্সের শোষণ তত্ত্ব দুটি শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুটি দেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে কিনা, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

দ্বিতীয়ত, অসম উন্নয়ন তত্ত্বের মূল কথা প্রেবিশ এবং সিঙ্গার তাঁদের তত্ত্বে অনেক আগেই বলে গেছেন। ইমানুয়েলের তত্ত্বটি যেন প্রেবিশ-সিঙ্গারের তত্ত্বেরই একটি রূপ। তাই অনেকে এই তত্ত্বটিকে আলাদা কোনো তত্ত্ব বলে মানতে নারাজ। কিন্তু এই দ্বিতীয় সমালোচনাটি বোধ হয় ঠিক নয়। ইমানুয়েল

অসম বিনিময়কে প্রেবিশ-সিঙ্গার ধরনের প্রতিকূল বাণিজ্য হারের (adverse terms of trade) ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বরং অসম বিনিময়কে ব্যখ্যা করার জন্য মার্ক্সের মূল্যের শ্রম তত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন।

৫.৭ বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা বা কে-র তত্ত্ব

Geoffrey Kay-র মতে, ঔপনিবেশিক যুগে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত দেশ থেকে আসা বাণিজ্য মূলধন উন্নত দেশের শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে। বাণিজ্য মূলধনের এই ভূমিকাই স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির জন্য দায়ী বলে কে' মনে করেন। তাঁর যুক্তি হল, বাণিজ্য মূলধন কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না বা পণ্য উৎপাদন করে না। তা শুধু পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মুনাফা অর্জন করে। ব্যবসায়ীরা যত বেশি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মুনাফাও তত বেশি হয়। তাই উৎপাদনী শক্তির বিকাশে বাণিজ্য মূলধনের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বলে কে' মনে করেন।

কে'-র তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। উন্নত দেশ থেকে আসা বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশে অ-ধনতান্ত্রিক (non-capitalist) উৎপাদকদের কাছ থেকে কাঁচামাল কেনে ও উন্নত দেশের উৎপাদকদের কাছে তা বিক্রি করে। শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে এই কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। এই কাজটি করে শিল্প মূলধন। এই শিল্পজাত দ্রব্যের একটা অংশ বাণিজ্য মূলধন কিনে স্বল্পোন্নত দেশে বিক্রি করে। সুতরাং, বাণিজ্য মূলধন চার রকমের বিনিময়ের কাজ করে : দুটি ক্রয়ের এবং দুটি বিক্রয়ের। আমরা সমগ্র বিনিময় চক্রটি এভাবে লিখতে পারি :

$$M — C — M' — C' — M''$$

যেখানে M হল অর্থের প্রতীক এবং C হল পণ্যের প্রতীক।

এই সমগ্র বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রথম অংশের $M — C — M'$ মুনাফা হল $(M' — M)$। এই মুনাফা দুটি সূত্রে আসতে পারে : (i) ব্যবসায়ীরা কাঁচামালের জন্য কম মূল্য দিতে পারে। (ii) তারা কাঁচামাল বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে। তেমনি, বিনিময় চক্রের দ্বিতীয় অংশের $(M' — C' — M'')$ মুনাফা হল $(M'' — M')$। এই মুনাফাও অনুরূপভাবে দুটি সূত্র থেকে আসতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য মূলধনের মুনাফার উৎস হল দুটি : (i) উন্নত দেশের উৎপাদনশীল মূলধনের উদ্বৃত্ত মূল্য এবং (ii) স্বল্পোন্নত দেশের অ-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত মূল্য।

কে-র যুক্তি হল, প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উন্নত দেশগুলিকে শিল্প মূলধনের ক্ষমতা বাড়তে লাগল এবং ইহা বাণিজ্য মূলধনের উপর আধিপত্য বিস্তার করল। বাণিজ্য মূলধন কিন্তু তার ফলে অবলুপ্ত হল না। ইহা বিশ্ব অর্থনীতিতে পুরনো দু'রকম আকারেই রয়ে গেলো : (i) বাণিজ্য মূলধন তার নিজের জন্য

মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করত এবং (ii) অন্যদিকে এই মূলধন শিল্প মূলধনের জন্যও মুনাফা অর্জন করত। এখন, বাণিজ্য মূলধন শুধু পণ্য বিনিময়ের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই মূলধন পণ্য উৎপাদন বা মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু শিল্প মূলধন প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে মুনাফার হার বাড়াতে পারে। তাই বাণিজ্য মূলধনের মুনাফার হার বাড়ানোর একটা সীমা আছে। তাই যখন শোষণের মাত্রা বা হার কমে গেল, বাণিজ্য মূলধন তখনই একটা সংকটের সম্মুখীন হল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই মূলধনের স্বাধীনতা ও একাধিপত্য লুপ্ত হল। বাণিজ্য মূলধন তখন শিল্প মূলধনের শুধুমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হল। অধ্যাপক কে' মনে করেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব থেকেই অনুন্নতির শুরু।

কে' উল্লেখ করেছেন যে, শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের তিন ধরনের স্বার্থরক্ষার কাজ করত : (i) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে সস্তায় কাঁচামলের জোগান দেওয়া, (ii) ঐ দেশগুলি থেকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্যও জোগান দেওয়া এবং (iii) শিল্প মূলধনের তৈরি দ্রব্যসামগ্রী অনুন্নত দেশে বিক্রি করা। এই সমস্ত কাজ করার ক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের কিছু বাড়তি সুবিধা ছিল। শিল্প মূলধনের প্রয়োজনমতো স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাণিজ্য মূলধন পুনর্গঠিত করে নিয়েছিল। তা ছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা নিজের স্বার্থে এবং শিল্প মূলধনের স্বার্থে ঘটানো হয়েছিল।

এ সমস্ত কারণে শিল্প মূলধন আর উন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশে যাওয়ার কোনো তাগিদ অনুভব করেনি। সরাসরি এসে বিনিয়োগ করার যাবতীয় সুবিধা সে তার প্রতিনিধি বাণিজ্য মূলধন মারফৎ পেয়ে গেছে। তাই বাণিজ্য মূলধনের আধিপত্য স্বল্পোন্নত দেশে দীর্ঘদিন বজায় ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে শিল্প মূলধন, বাণিজ্য মূলধনের উপর জয়লাভ করেছিল। কে-র মতে, স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এটা ছিল দু'দিক থেকে ক্ষতিকর। একদিকে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প মূলধনের বিকাশে বাধা দিয়েছিল। অন্যদিকে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদন কাঠামোকে ভেঙে এমনভাবে পুনর্গঠিত করেছিল যাতে উন্নত দেশের শিল্প মূলধনের স্বার্থ বজায় থাকে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলি অনুন্নতই থেকে যায়, সেখানে শিল্পায়ন ঘটেনি।

৫.৭.১ কে-র তত্ত্বের মূল্যায়ন

কে-র তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, যানবাহন ও যোগাযোগের উন্নতি ছাড়া বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে প্রবেশ করতে পারত না। কিন্তু কে-র তত্ত্বে যানবাহন ও যোগাযোগের ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** কে-র তত্ত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়েছে। বিশ্বে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশ হল পোর্তুগাল ও স্পেন। উপনিবেশিক যুগে এই দেশগুলি তাদের উপনিবেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরণ করেছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও উপযুক্ত শিল্প প্রযুক্তির অভাবে এই দেশগুলি তাদের সংগৃহীত উদ্বৃত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ফলে বিশ্বে প্রথম শিল্প বিপ্লব ঐ দেশ দুটিতে

ঘটেনি। অন্যদিকে, গ্রেট ব্রিটেনে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছিল বলে সেখানে উপনিবেশের সম্পদ কাজে লাগিয়ে শিল্প বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। **তৃতীয়ত,** বিদেশি মূলধন উপনিবেশে কিছু কিছু বিনিয়োগ করেছিল, যেমন, চা, কফি, রবার প্রভৃতি বাগিচা শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপিকা লা মিন্ট (Hla Myint) বলেছেন যে, এক্ষেত্রে কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং এধরনের বিনিয়োগ স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে না।

এসমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, বাস্তব পরিসংখ্যান থেকে কে-র তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত থেকে ব্রিটেনে একতরফাভাবে সম্পদের নিঃসরণ (drain of resources) ঘটেছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গ্রেট ব্রিটেন ভারতের শিল্প কাঠামোকে ভেঙে ফেলেছিল। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পতন ঘটতে থাকে যাকে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা শিল্প-অপনয়ন (de-industrialisation) বলে অভিহিত করেছেন। তাই ভারত তার সম্পদ নিজের শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক যুগ এখন অতীত। কিন্তু বর্তমানে উন্নত দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করছে। এভাবে বর্তমান বিশ্বে এক নয়া-উপনিবেশবাদ বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদ ফিরে এসেছে। এসবের জন্যই আজকের স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না বলে অনেকে, বিশেষত বামপন্থীরা, মনে করেন। তবুও একথা বলতেই হয় যে, বাণিজ্য মূলধনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষণ অনুন্নতির একমাত্র কারণ নয়। অনুন্নতির পিছনে আরো অনেক কারণ থাকতে পারে।

৫.৮ সারাংশ

১. অনুন্নতির বিস্তার : ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্ব (Development of Underdevelopment : Frank's Theory) : ফ্রাঙ্কের মতে, অনুন্নতি এবং উন্নতি আসলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ারই দুটি দিক। উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ নিঃসরণ করার ফলে ঐ উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে তারা অনুন্নতই রয়ে গেছে। একই সঙ্গে, উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত বেড়েছে। তা ঐ সমস্ত দেশের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হল যে, এই তত্ত্বটি আদৌ বিশ্লেষণধর্মী নয়। অনেক ক্ষেত্রে এটি তাঁর ব্যক্তিগত বিবৃতি।

২. পল ব্যারন-এর নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory of Paul Baran) : ব্যারন-এর মতে, উপনিবেশগুলি তাদের শাসক দেশগুলির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শাসক দেশগুলি উপনিবেশগুলির উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। ফলে একদিকে উপনিবেশগুলির অনুন্নতি ঘটেছে এবং অন্যদিকে একই সময়ে উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নয়ন ঘটেছে। ব্যারন আরো বলেছেন যে, স্বল্পোন্নত দেশের উদ্বৃত্ত অনেক সময় অনুৎপাদনশীল ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়েছে। ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলি অনুন্নতই রয়ে গেছে।

৩. ইমানুয়েলের অসম বিনিময় তত্ত্ব (Theory of Unequal Exchange of Emmanuel) : মার্ক্সের মূল্যের শ্রম তত্ত্বকে ব্যবহার করে ইমানুয়েল দেখিয়েছেন যে, উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সময় অসম বিনিময় ঘটে। এই অসম বিনিময়ের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশগুলি উন্নত দেশ দ্বারা শোষিত হয়। ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অনুন্নতি এবং উন্নত দেশে উন্নতি ঘটে। এই তত্ত্বের আর একটি সিদ্ধান্ত হল যে, স্বল্পোন্নত দেশের জনগণকে শোষণের দ্বারা উন্নত দেশের শ্রমিকেরা লাভবান হয়। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান মত হল যে, মার্ক্সের দুই শ্রেণির মধ্যে শোষণের আলোচনা দুটি দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৪. বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা বা কে-র তত্ত্ব (Role of Merchant Capital in World Economy, or, Kay's Theory) :

কে-র মতে, উন্নত দেশের বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশের উৎপাদকের কাছ থেকে কাঁচামাল কেনে এবং তা উন্নত দেশে বিক্রি করে। উন্নত দেশে এগুলির দ্বারা শিল্পজাত পণ্য তৈরি হয়। এই শিল্পজাত পণ্যের একটা অংশ আবার বাণিজ্য মূলধন কেনে এবং তা অনুন্নত দেশে বিক্রি করে। এই কাজে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশকে দু'বার শোষণ করে। কে-র মতে, বাণিজ্য মূলধন কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না। ইহা শুধু বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মুনাফা অর্জন করে। তিনি বলেছেন যে, ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ঠিক আগে, শিল্প মূলধনের আধিপত্য বাণিজ্যিক মূলধন অপেক্ষা বেড়ে গেল। তখন বাণিজ্য মূলধন উপনিবেশগুলিতে শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে লাগলো। এই মূলধন দিয়ে বাণিজ্য মূলধন উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচামাল কিনতে লাগলো এবং সেখানে শিল্পজাত দ্রব্য চড়া দামে বেচতে লাগলো। এছাড়া, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সুনিশ্চিত করতে ইহা উপনিবেশের দেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করলো। এভাবে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্প মূলধনের এজেন্ট বা প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে লাগলো। কে-র মতে, বাণিজ্য মূলধনের এই ভূমিকার ফলেই উপনিবেশগুলিতে অবনতি ঘটল এবং পাশাপাশি উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নতি ঘটতে লাগলো।

৫.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. ফ্রাঙ্কের অনুন্নতি সম্পর্কিত বইটির নাম কী?
২. অনুন্নতির তত্ত্বে কেন্দ্র ও প্রান্ত বলতে কী বোঝেন?
৩. ফ্রাঙ্ক-এর তত্ত্বে অনুন্নতি থেকে মুক্তির উপায় কী?
৪. পল ব্যারনের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব সম্পর্কিত বইয়ের নাম কী?
৫. উন্নয়ন অর্থনীতিতে 'নির্ভরশীলতা' বলতে কী বোঝেন?

৬. ব্যারনের মতে সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের চারটি আকার কী কী?

৭. অসম বিনিময় তত্ত্বের একজন মুখ্য প্রবক্তার নাম বলুন।

৮. অসম বিনিময় তত্ত্বের একটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

৯. কে'-কে অনুসরণ করে বাণিজ্যিক মূলধনের আবর্তনের রূপটি লিখুন।

১০. অনুন্নতি সম্পর্কে কে-র তত্ত্বের মূলকথা কী?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. ফ্রাঙ্কের উপনিবেশবাদ তত্ত্বের প্রধান সমালোচনাগুলি কী কী?

২. ব্যারনের তত্ত্বের প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

৩. অসম বিনিময় তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি কী কী?

৪. বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা সম্পর্কে কে-র তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. অনুন্নতির বিস্তার সম্পর্কে ফ্রাঙ্কের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

২. পল ব্যারনের নির্ভরশীলতার তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. নির্ভরশীলতার তত্ত্ব হিসাবে ফ্রাঙ্ক এবং ব্যারনের তত্ত্বের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. সমালোচনাসহ ইমানুয়েলের অসম বিনিময় তত্ত্বটি পরীক্ষা করুন।

৫. উপনিবেশের যুগে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্ত (2007) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ব্লক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. Baran, P. (1957) : The Political Economy of Growth, The Monthly Review Press, New York

৩. Blaug, M. (1968) : Economic Theory in Retrospect, Heinemann, London.

৮. Kay, G. (1975) : Development and Underdevelopment : A Marxist Analysis, Macmillan, London.

একক ৬ ❑ রাষ্ট্রের ভূমিকা

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ অর্থনীতির প্রধান শিখরগুলি

৬.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা

৬.৫ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজারের ভূমিকা

৬.৫.১ বাজারের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা

৬.৬ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা

৬.৭ রাষ্ট্র বনাম বাজার

৬.৮ সমাজতন্ত্রে দাম নির্ধারণ

৬.৮.১ দাম নির্ধারণে সমস্যা ও তার সমাধান

৬.৯ সামাজিক দ্রব্য ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ

৬.১০ সামাজিক দ্রব্যের কাম্য সরবরাহ

৬.১১ সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

৬.১২ সারাংশ

৬.১৩ অনুশীলনী

৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা
- অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজারের ভূমিকা

- ❖ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুবিধা
- ❖ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ
- ❖ সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য এবং এই দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

৬.২ প্রস্তাবনা

কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা কেমন হবে সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অষ্টাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে একটি অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল। সেই মতবাদ বাণিজ্যবাদ নামে পরিচিত। এই বাণিজ্যবাদীরা দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেছেন। তাঁদের মতে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পাশাপাশি ঐ সময়ে ফ্রান্সে আর একটি মতবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটি হল প্রকৃতিবাদ। এই প্রকৃতিবাদীরাও অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। তাঁদের সুপারিশ হল, সরকারের এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

এরপর অষ্টাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপ প্রসার লাভ করে ধ্রুপদি বা প্রাচীন অর্থনীতি (classical economics)। এই অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রবক্তারা হলেন অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন অ্যাডাম স্মিথ যাঁকে অর্থবিদ্যার জনক বলা হয়। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁরা ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেননি। অ্যাডাম স্মিথের মতে, অবাধ অর্থনীতির (laissez faire economy) দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক কার্যাবলি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অ্যাডাম স্মিথ এই দাম ব্যবস্থাকেই বলেছেন অদৃশ্য হস্ত (invisible hand)। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা কাজ করে যা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে কোনোরকম সরকারি হস্তক্ষেপ তাঁরা সমর্থন করেননি। নয়া-প্রাচীন (neo-classical) অর্থনীতিবিদেরাও সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্র বা সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে এই মতবাদ মোটামুটিভাবে 1930 সাল পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তারপরই প্রাচীন এবং নয়া-প্রাচীন মতবাদ ধাক্কা খায়। 1929 সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয়। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা দূর করতে কেইন্‌স্ সরকারি হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেন। তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সরকার উপযুক্ত রাজস্ব নীতির দ্বারা মন্দা ও বেকারত্ব দূর করতে পারে। পাশাপাশি রয়েছে মার্ক্সবাদী বা সমাজতন্ত্রীদের মতামত। তাঁরা মনে করেন, সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তাহলেই সম্পদের কাম্য বণ্টন ও ব্যবহার ঘটবে এবং এর ফলে দেশের উন্নয়ন হার সম্ভাব্য সর্বাধিক হবে। এই মত প্রাচীন

ধনবিজ্ঞানীদের অবাধ অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত যাঁরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক তত্ত্ব "যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যাশা তত্ত্ব" বা প্রকল্পেও (Rational Expectation Hypothesis) আমরা প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মতের প্রতিধ্বনি পাই। এই যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যাশা মতবাদের (Rational Expectation School) মুখ্য প্রবক্তারা হলেন Lucas, Sergent এবং Wallace. এঁদের বক্তব্য হল, অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ কোনো সমস্যার সমাধান করতে তো পারেই না, বরং সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। এজন্য এই মতবাদকে নতুন প্রাচীন অর্থনীতি (New classical economics) বলে অভিহিত করা হয়। যাই হোক, অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্তমান মতটি হল অবাধ অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ। বর্তমানে বাজার ব্যবস্থার সুফল নিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নিয়ন্ত্রিত আকারে বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। আবার ধনতন্ত্র বা অবাধ অর্থনীতির বাজার ব্যবস্থার বাণিজ্যচক্রজনিত কুফল দূর করতে কিছু সংশোধনমূলক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হচ্ছে। তাই একেবারে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা অবাধ অর্থনীতি বলে কিছু আর নেই। পরিবর্তে এসেছে নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র। তেমনি, পুরোপুরি পরিকল্পিত অর্থনীতিও এখন বিরল। পরিবর্তে এসেছে বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্র (market socialism)। দুটি বিরোধী মত দিন দিন যেন কাছাকাছি চলে আসছে। এর ফলে উদ্ভব হয়েছে মিশ্র অর্থনীতির, যা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিশ্ররূপ, যেখানে বাজার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সহাবস্থান করে। Jan Tinbergen তাঁর Convergence Hypothesis বা মিশে যাওয়ার প্রকল্পে বলেছেন যে, দুটি বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একদিন পুরোপুরি একে অপরের সাথে মিশে যাবে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সেই প্রবণতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অবশ্য কতদিনে এই সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে তা কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

৬.৩ অর্থনীতির প্রধান শিখরসমূহ

কোনো অর্থনীতির প্রধান শিখরগুলি বলতে এক কথায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সামগ্রিকভাবে কোনো অর্থনীতির গতিপথ ও উন্নয়নের হার নির্ধারণ করে। সেই commanding heights বা অর্থনীতির উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লেখ করা হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (1917) পর। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উন্নয়নের ধরন কেমন হবে সেই প্রসঙ্গেই অর্থনীতির প্রধান শিখরগুলির (commanding heights) কথা বলা হয়। এই ধারণাটির পটভূমিকা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

1917 সালে নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের সময় দেশে চলছিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, জ্বালানি ঘাটতি, বিপর্যস্ত পরিবহন ব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রে চরম অরাজকতা। 1918 সালের মধ্যভাগ থেকে 1921 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়কালে যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হয় তাকে বলা হয় সামরিক সাম্যবাদ। এই নীতিকে এক কথায় বলা যেতে পারে 'extreme communisation' বা চরম স্তরের

সাম্যতা। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল : (i) সকল রকম বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ; (ii) চাষিদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ (iii) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর সরকারি একাধিপত্য, এবং (iv) সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব। কিন্তু এই অতি নিয়ন্ত্রণের ফলে কিছু প্রতিকূল ফলাফল ঘটে। সেগুলি হল : (i) চাষের জমির পরিমাণে হ্রাস, (ii) মাঝারি ও বড় চাষিদের ক্ষোভ, (iii) সমবায় সমিতিগুলির অসহযোগিতা, (iv) উপকরণ সরবরাহে বৈষম্য, (v) অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রভৃতি। এক কথায়, সামরিক সাম্যবাদের কালে মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার অর্থনীতিকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। লেনিন গ্রহণ করলেন কৌশলগত পশ্চাদপসরণ (tactical retreat)। তিনি ঘোষণা করলেন নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy বা NEP)। এই সময়ে শিল্প কারখানাগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি কীরকম হবে সেই প্রসঙ্গেই অর্থনীতির প্রধান শিখরগুলি বা শীর্ষবিন্দুগুলির (commanding heights of the economy) কথা বলা হয়। নয়া অর্থনৈতিক নীতির মূল কথা হল ছোটো ও মাঝারি আয়তনের শিল্পগুলিকে বিকেন্দ্রায়িত করা বা বিজাতীয়করণ করা এবং বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করা এবং জাতীয়করণ করা। এই বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকেই অর্থনীতির প্রধান শিখর বিন্দু বা শীর্ষবিন্দু বলা হচ্ছে। এই শিল্পগুলিই দেশের শিল্পের অগ্রগতির হার এবং শিল্পের কাঠামো নির্ধারণ করে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের সময় সরকারি ক্ষেত্রের মূল ও ভারী শিল্পগুলিকেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'অর্থনীতির প্রধান শিখরসমূহ' বলে অভিহিত করেছিলেন। ঐ পরিকল্পনায় দুর্গাপুর, ভিলাই এবং রাউরকেল্লায় সরকারি ক্ষেত্রের অধীনে তিনটি লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৬.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্র বা তার তরফে সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা সেগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি :

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিতে হয়। সাধারণত ব্যক্তিগত পুঁজিপতি এ ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। রাষ্ট্রকেই এগিয়ে এসে মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হয়।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সরকার উপযুক্ত আর্থিক নীতির দ্বারা জনসাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে পারে। তা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে সরকার দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারে।

৩. শুধু সঞ্চয় সংগ্রহ করলেই হবে না, সেই সঞ্চয় উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োতি হওয়া দরকার। সঞ্চয় যেন ফাটকাবাজিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত না হয়। তার জন্য প্রধানত দামস্তরের স্থিতিশীলতা দরকার। সরকার উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব নীতির দ্বারা দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সম্পদের কাম্য বণ্টন ও ব্যবহার। এর জন্য চাই উপযুক্ত

পরিকল্পনা রচনা করা এবং তা রূপায়ণ করা। রাষ্ট্র বা সরকারই পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহার ঘটাতে পারে।

৫. ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করতে আগ্রহী যে সমস্ত ক্ষেত্রে মুনাফার হার বেশি। তারা পরিবেশ রক্ষা, পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার, সমাজের কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। ভূমিক্ষয়, বায়ুদূষণ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তারা অবহেলা করতে পারে। রাষ্ট্রই এ সমস্ত বিষয়ে নজর দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামাজিক ব্যয় সর্বনিম্ন রাখতে পারে।

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় মূলধনি শিল্প এবং ভোগ্য দ্রব্যের শিল্পের বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হয়। যদি ভোগ্য দ্রব্যের শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে মূলধনি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ঘাটতি দেখা দেবে। যদি মূলধনি শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে ভোগ্য দ্রব্যের ঘাটতির জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের হার সর্বোত্তম হবে না। রাষ্ট্র বা সরকারই পরিকল্পনার দ্বারা ভোগ্য দ্রব্য শিল্প এবং মূলধনি দ্রব্যের শিল্পের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

৭. দেশে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকার বাজেটে ঘাটতি রাখতে পারে এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের দ্বারা বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করতে পারে।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানব মূলধনে বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রই শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে মানব মূলধনের মান উন্নত করতে পারে।

৯. উপযুক্ত রাজস্ব নীতির দ্বারা সরকার জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা উৎসাহিত করতে পারে। সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত।

১০. সরকার বিদেশি মূলধন, বিদেশি সাহায্য এবং বিদেশি প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলেও দেশটির উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

১১. শিশু শিল্প সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের নানাভাবে উৎসাহ দান, উপযুক্ত বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন, অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ইত্যাদির দ্বারাও কোনো দেশের সরকার সেই দেশের অর্থনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে।

৬.৫ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজারের ভূমিকা

বাজারের প্রধান কাজ হল কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম নির্ধারণ করা। এই বাজার ব্যবস্থা বা দাম ব্যবস্থা কোনো দেশে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে থাকে। এখন, বাজারগুলি প্রধানত দু'রকমের : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে

চাহিদা ও জোগানের শক্তি অবাধে কাজ করে। এই বাজারে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। উৎপাদনের উপকরণগুলি এই বাজারে সম্পূর্ণরূপে সচল। তা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। এক কথায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতা হল একটি অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা অবাধ বাজার ব্যবস্থা। অ্যাডাম স্মিথের মতে, এই ব্যবস্থায় একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা কাজ করে যা বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটি আসলে অবাধ অর্থনীতির দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থা। এই দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক কার্যাবলি সুচারুরূপে এবং দক্ষভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অ্যাডাম স্মিথ এই স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থাকে বলেছেন অদৃশ্য হস্ত (invisible hand)। এই অদৃশ্য হস্তকে দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থাও বলা হয়। স্মিথ বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় ব্যক্তির স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য (harmony) স্থাপিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ব্যক্তির স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত আছে। কিন্তু স্মিথের মতে, এটি ঠিক নয়। যদি প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করতে পারে, তাহলে সে সেই কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করবে যেটিতে তার নিজের স্বার্থের সর্বাধিক পূরণ হয়। এভাবে যদি প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজের স্বার্থ সর্বাধিক পূরণ করতে পারে, তাহলে সমাজের স্বার্থও সর্বাধিক পূরণ হবে অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণও সর্বাধিক হবে। এভাবে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এখন, দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থা কীভাবে কোনো অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করে তা দেখা যাক। আমরা আগেই বলেছি যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সার্বভৌমত্ব থাকে। এর অর্থ হল, ক্রেতারা কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণে কিনবে সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তেমনি, বিক্রেতারা কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণে বিক্রি করবে সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই ক্রয় ও বিক্রয় পর্ব সম্পর্কযুক্ত। এই দাম ব্যবস্থা সমাজের ব্যক্তিদের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করে এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে। এখন, অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, কোনো অর্থনীতির মৌলিক বা কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যা তিনটি। সেই তিনটি হল : (i) কী কী দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপন্ন করা হবে? (ii) কীভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে? (iii) কাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে? **প্রথমটিকে** আমরা বলতে পারি উৎপন্ন দ্রব্য নির্বাচনের সমস্যা। **দ্বিতীয়টি** হল উপযুক্ত উৎপাদন কৌশল নির্বাচনের সমস্যা। আর **তৃতীয়টি** হল উৎপন্ন দ্রব্য বা তা থেকে উদ্ভূত আয় বণ্টনের সমস্যা। এখন, দাম ব্যবস্থায় বা বাজার ব্যবস্থায় কীভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় তা বিবেচনা করা যাক।

ক্রেতারা যে দ্রব্যটি বেশি পছন্দ করে তারা সেই দ্রব্যটি বেশি কিনতে চাইবে এবং দ্রব্যটির জন্য বেশি দাম দিতে রাজি হবে। তাহলে উৎপাদনকরাও ঐ দ্রব্য বেশি পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং বেশি পরিমাণ

বিক্রি করবে। তেমনি, যে দ্রব্য ক্রেতাদের কম পছন্দ, সেই দ্রব্য কম পরিমাণ উৎপন্ন হবে এবং কম দামে বিক্রি হবে। তাহলে, বেশি পছন্দের দ্রব্যের উৎপাদনে বেশি উপকরণ নিয়োগ করা হবে এবং কম পছন্দের দ্রব্যের উৎপাদনে কম পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করা হবে। সুতরাং বাজার ব্যবস্থাই এক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। এখন, দ্বিতীয় সমস্যা হল, বিভিন্ন দ্রব্য কীভাবে উৎপাদন করা হবে অর্থাৎ কোন্ উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হবে সেটি ঠিক করা। কোন্ উপাদান উৎপাদনের কাজে কতটা নিয়োগ করা হবে সেটিও উপাদানের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে উপাদানের দাম কম, সেই উপাদান বেশি করে নিয়োগ করা হবে এবং যে উপাদানের দাম বেশি, সেই উপাদান কম পরিমাণে নিয়োগ করা হবে। আবার, কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে সেটিও বাজার ব্যবস্থা বা দাম ব্যবস্থা ঠিক করে। আমরা জানি, উৎপাদনের উপকরণ চারটি : জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের মালিকরা হল যথাক্রমে জমিদার বা জমির মালিক, শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং সংগঠক। এখন, চারটি উপাদানের প্রত্যেকটির একটি করে দাম আছে এবং সেই দামগুলিই হল ঐ সমস্ত উপাদানের মালিকদের আয়। জমির মালিকের আয় হল খাজনা, শ্রমিকের আয় হল মজুরি, পুঁজিপতির আয় হল সুদ বা যন্ত্রপাতির ভাড়া এবং সংগঠকের আয় হল মুনাফা। আবার, এই আয়ের উপরই নির্ভর করছে কোন্ শ্রেণি কতটা ভোগ করতে পারে। সুতরাং, আয়বণ্টন নির্ধারিত হয় উপাদানের দামের দ্বারা। আর উপাদানসমূহের দামও বাজার ব্যবস্থাই নির্ধারণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে থাকে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করতেন যে, যদি বাজার ব্যবস্থা বা দাম ব্যবস্থাকে অবাধে কাজ করতে দেওয়া হয় এবং যদি অর্থনৈতিক কাজকর্মে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকে, তাহলেই দেশের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে। সাম্প্রতিক কালের অনেক অর্থনীতিবিদও এই মতকে সমর্থন করেন।

বাজার ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ সুবিধার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অবাধ বাজার ব্যবস্থার **প্রথম** এবং প্রধান সুবিধা হল প্রতিযোগিতার সুবিধা। এই ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ উৎপাদক বাজার থেকে অপসৃত হয় এবং শুধুমাত্র সুদক্ষ উৎপাদকরাই দীর্ঘকালে বাজারে টিকে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাও দক্ষতম হয়। **দ্বিতীয়ত,** প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক উৎপাদক ও ভোগকারী অবাধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ফলে উভয় শ্রেণিরই উপযোগিতা সর্বাধিক হয়। **তৃতীয়ত,** অবাধ বাজার ব্যবস্থায় কেবল দক্ষতমরাই দীর্ঘকালে টিকে থাকে বলে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। ক্রেতারা সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি পায় বলে তাদের কল্যাণ বা ভোগকারীর উদ্বৃত্ত সর্বাধিক হয়। **চতুর্থত,** বাজার ব্যবস্থার চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। ফলে সরকারি অদক্ষতা, আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য ও দুর্নীতি ঘটে না। **পঞ্চমত,** বাজার ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকার করা হয়। ভোগ অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা থাকে।

৬.৫.১ বাজারের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা

বাজার ব্যবস্থা দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। ইহা দেশের সম্পদের দক্ষ বণ্টন ঘটায়, দেশের উপযুক্ত দ্রব্য সমন্বয় নির্ধারণ করে, দক্ষতম উৎপাদককে উপযুক্ত প্রতিদান পেতে সাহায্য করে, ক্রেতাকে সর্বনিম্ন দামে কোনো দ্রব্য পেতে সাহায্য করে, উপযুক্ত উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ করে ইত্যাদি। তবে বাজার ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, বাজার ব্যবস্থা সম্পদের দক্ষ বণ্টন ঘটায় যদি বাজারটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজার হয়। কিন্তু বাস্তবে বাজারে নানা অপূর্ণাঙ্গতা থাকে। সেক্ষেত্রে সম্পদের দক্ষ বণ্টন ঘটে না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রায়শই সম্পদের অপচয় ঘটে।

দ্বিতীয়ত, অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক সময়ই ক্রেতা শোষিত হয় বিক্রেতার দ্বারা। সেক্ষেত্রে ক্রেতার তৃপ্তি সর্বাধিক হয় না।

তৃতীয়ত, অবাধ প্রতিযোগিতার বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে এই বাজারে সেই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় যেগুলিতে মুনাফা সবচেয়ে বেশি। এর ফলে অনেক অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন হতে পারে।

চতুর্থত, অবাধ বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার ফলে কেবল যোগ্যতমরাই টিকে থাকে। যে বেশি দক্ষ, সে বেশি প্রতিদান পায়। ফলে এই ব্যবস্থায় আয় বণ্টনের বৈষম্য ঘটে।

পঞ্চমত, বাজার ব্যবস্থা অবাধ হলে কখনো অতি উৎপাদন, কখনো বা স্বল্প উৎপাদন; কখনো উচ্চ দামস্তর, কখনো বা স্বল্প দামস্তর প্রভৃতি ঘটে থাকে। এক কথায়, অবাধ বাজার ব্যবস্থায় আয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা ঘটে থাকে।

ষষ্ঠত, পূর্ণাঙ্গ বাজার ব্যবস্থার কিছু সুফল থাকলেও বাস্তবে বাজারে নানা অপূর্ণাঙ্গতা বা অসম্পূর্ণতা থাকে। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নানা কুফল দেখা যায়। এগুলি হল উচ্চ দাম, অস্বাভাবিক মুনাফা, অনুৎপাদনশীল বিজ্ঞাপন ব্যয়, সম্পদের অপচয়, উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি।

সপ্তমত, অবাধ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতার সার্বভৌমত্ব থাকে বলে যে দাবি করা হয় তাও বাস্তবে থাকে না। বাস্তবে বিজ্ঞাপন ও প্রচার কৌশলের দ্বারা ক্রেতাদের পছন্দকে প্রভাবিত করা হয়।

বাজার ব্যবস্থার এই সমস্ত অসুবিধা দূর করতে হলে বাজারের কার্যপদ্ধতির উপর কিছু সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়। অবাধ বাজার ব্যবস্থা সমাজে নানা অকাম্য অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

৬.৬ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা

অধ্যাপক ডিকিনসনের ভাষায়, সামগ্রিকভাবে কোনো অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার ভিত্তিতে দেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কীভাবে কাদের মধ্যে বণ্টিত

হবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে। আমরা জানি, স্যামুয়েলসন বলেছেন যে, কোনো অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা তিনটি : কী কী দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। আর অপরিকল্পিত বা অবাধ অর্থনীতিতে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় বাজার ব্যবস্থা বা দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে।

প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য পরিকল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় শক্তি সব রকমের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে দেবে। এই স্বয়ংক্রিয় শক্তিকেই অ্যাডাম স্মিথ অদৃশ্য হাত (invisible hand) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাজারি শক্তির উপর যদি কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে অর্থনীতিতে নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এজন্য অনেক অর্থনীতিবিদ বাজারি শক্তির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বড় আকারের সরকারি নিয়ন্ত্রণই আসলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। অনিয়ন্ত্রিত বাজারি শক্তির দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাবলিকে দূর করতে হলে উন্নত বা স্বল্পোন্নত দু'ধরনের দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আমরা প্রথমে উন্নত অর্থনীতিতে পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা করবো। তারপর স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতেও পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা করা হবে।

উন্নত অর্থনীতিতে পরিকল্পনার ভূমিকা

নিম্নলিখিত কারণে উন্নত অর্থনীতিতে পরিকল্পনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, বাজারি শক্তিকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে কখনও বেশি পরিমাণ আয় ও কর্মসংস্থান ঘটবে, আবার কখনওবা আয় ও কর্মনিয়োগের স্তর কম হবে। আয় ও নিয়োগের এরূপ ওঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলে। এই বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা দূর করতে বা তার তীব্রতা কমাতে পরিকল্পনা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র অসাম্য তৈরি হয়। এই ব্যবস্থায় যোগ্যতার ভিত্তিতে আয়ের বণ্টন হয়। আবার, যাদের আয় বেশি, তাদের আরও আয়ের সুযোগও বেশি। ফলে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বাড়তে থাকে। এটি দূর করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। উপযুক্ত আয় ও নিয়োগ নীতি প্রবর্তন করে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য অনেকটাই দূর করা যায়।

তৃতীয়ত, বাজার ব্যবস্থায় দেশের সম্পদের অপবণ্টন ঘটতে পারে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা সেই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে সম্পদ নিয়োগ করে যেখানে মুনাফা বেশি। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন সমাজের পক্ষে কাম্য নাও হতে পারে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সম্পদের এই ধরনের অপব্যবহার দূর করা যায়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে কাম্য ব্যবহারে নিয়োগ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, অবাধ বাজার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ফলে কখনও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, কখনও উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ভারসাম্যহীনতা দেশের

অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যকেও বিনষ্ট করে। তা ছাড়া, অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিলাসদ্রব্যসহ অনেক অকাম্য দ্রব্যের আমদানি হতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের বহু কষ্টে উপার্জিত দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটে। এগুলি রোধ করতে হলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, অবাধ বাজার ব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা অনেক সময়ই দেশের পরিবেশ বিনষ্ট করে। দ্রুত মুনাফা লাভের আশায় ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তারা অনেক অ-নবীকরণযোগ্য (non-renewable) সম্পদ নষ্ট করে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমন উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্ববহনক্ষম (sustainable) থাকে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদের এই অপচয় এবং হ্রাস (depletion) বন্ধ করা যেতে পারে।

☐ স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি :

উন্নত দেশগুলিতে পরিকল্পনা যে সমস্ত কারণে প্রয়োজন, অনুন্নত দেশেও উপরোক্ত কারণগুলির জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। এছাড়া, আরো কতকগুলি বিশেষ কারণে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রথমত, স্বল্পোন্নত দেশে একটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বা নিম্ন স্তরের আয়ের ফাঁদ কাজ করে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে একটি জোর ধাক্কার প্রয়োজন অর্থাৎ বড় আকারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া এটি সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিকাঠামো (social infrastructure) বা সামাজিক স্থির মূলধন (social overhead capital) একান্ত প্রয়োজন। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রেল ও সড়ক পরিবহন, বৃহদায়তন সেচ প্রকল্প প্রভৃতি হল এরূপ মূলধনের উদাহরণ। এগুলি গড়ে তুলতে বড় আকারের বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং এগুলির সুফল দেরিতে পাওয়া যায়। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। সরকারই পরিকল্পনার মাধ্যমে এই ধরনের মূলধন প্রকল্প স্থাপন করতে পারে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা দরকার। এগুলি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। এই ধরনের শিল্প স্থাপন করার জন্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হয়। উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমেই এটা করা যেতে পারে।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠন একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য অধিক সঞ্চয় প্রয়োজন। সরকার দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বিমা ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রসার ঘটিয়ে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করতে পারে। আবার, ধনীদের অবাঞ্ছিত ভোগ এবং বিলাসবহুল ভোগ নিয়ন্ত্রণ করেও দেশের সঞ্চয় বাড়ানো যেতে পারে। উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমেই এগুলি করতে হয়।

পঞ্চমত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে অনেক সময় সাজসরঞ্জাম এবং কলাকুশলী আনতে হয়। এজন্য প্রয়োজন পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার। এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং তার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, দেশে সুষম উন্নয়ন ঘটাতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন বা প্রসারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। নতুবা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সরকার উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। তবে উন্নত অপেক্ষা অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি।

৬.৭ রাষ্ট্র বনাম বাজার

প্রাচীন বা ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদগণ (classical economists) দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। এঁদের মতে, অবাধ অর্থনীতিতে কোনোরূপ সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। যদি বাজার ব্যবস্থা বা দাম ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে এই ব্যবস্থার দ্বারাই অর্থনীতির সমস্ত মৌলিক বা প্রধান সমস্যাবলির সমাধান হবে। প্রাচীন অর্থতত্ত্বে (classical economics) এই মতের মুখ্য প্রবক্তা ছিলন অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ। পরবর্তীকালে 1950-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যানও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ফ্রিডম্যানের নেতৃত্বে এই মতবাদকে বলা হয় শিকাগো দৃষ্টিভঙ্গি (Chicago school of thought)। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের (1990-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে) একটি অর্থনৈতিক মতবাদেও অনুরূপ মত ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অর্থনৈতিক মতবাদটির নাম যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যাশার দৃষ্টিভঙ্গি বা Rational Expectation Hypothesis. এই মতবাদের মুখ্য প্রবক্তা হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ রবার্ট লুকাস (জুনিয়র) (1995)। এই মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, কোনো অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে যদি সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, বরং সরকার সেই সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যক্তির অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলে এই মতবাদকে নতুন প্রাচীন ধনবিজ্ঞান বা New Classical Economics বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনেক অর্থনীতিবিদ দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেছেন। যেমন, প্রাচীন বা ধ্রুপদি অর্থবিজ্ঞানের পূর্বে পশ্চিম ইউরোপে প্রচারিত বাণিজ্যবাদ (mercantitism) এবং প্রকৃতিবাদে (physiocracy) দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং পৃষ্ঠপোষকতা চাওয়া হয়েছে। 1930 সালের মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা মহামতি কেইন্‌স্-এর General Theory (1936) বইয়েও রাষ্ট্রের কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। কেইন্‌স্-এর মতে, অবাধ বাজারি ব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুঁজিবাদের বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা দূর করতে পারে না।

সরকার যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে অবাধ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্দা ও বেকারত্ব থাকবেই। তিনি এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। আর সমাজতন্ত্রী অর্থনীতিবিদেরা তো সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চান। তাঁদের মতে, পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত। তবেই সমাজের উন্নতি এবং কল্যাণ সর্বাধিক হবে। বাজার ব্যবস্থার হাতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ছেড়ে দিলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে, সম্পদের অপচয় হবে এবং দেশের অগ্রগতি তথা কল্যাণ ব্যহত হবে বলে তাঁদের অভিমত। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করেন। বর্তমান চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনেও পরিকল্পনার কৃতিত্ব বলে তাঁদের দাবি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র বনাম বাজার এই বিতর্কে অর্থনীতিবিদেরা দুটি শিবিরে বিভক্ত। যাঁরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের **প্রথম এবং প্রধান** অভিযোগ হল রাষ্ট্র বা সরকারের অদক্ষতা। সরকারি ক্ষেত্রে কাজে অনেকের উৎসাহের অভাব। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কাজের প্রতিদান সম্পূর্ণ নিজের বলে সেখানে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা বেশি। **দ্বিতীয়ত,** রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অত্যধিক হলে দেশি ও বিদেশি মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহী নাও হতে পারে। **তৃতীয়ত,** অনেকের মতে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আমলাতন্ত্রের জন্ম দেয়। এই ব্যবস্থা অপচয়মূলক। **চতুর্থত,** অবাধ বাজার ব্যবস্থা সম্পদের সর্বোত্তম বণ্টন ঘটায়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সম্পদের অপবণ্টন বা অদক্ষ বণ্টন ঘটাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

কিন্তু যাঁরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চান, তাঁরা বলেছেন যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার ব্যবস্থা সম্পদের কাম্য বণ্টন ঘটায় বটে, কিন্তু বাস্তবে বাজারে পূর্ণ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে না। বাস্তবে বাজারে নানা অপূর্ণতা থাকে। বাজারের সেই অপূর্ণতা দূর করতেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে তাঁদের **দ্বিতীয়** যুক্তি হল কল্যাণের যুক্তি। এই ব্যবস্থা বাজার ব্যবস্থার ন্যায় আয় বৈষম্য ঘটায় না। **তৃতীয়ত,** বাজার ব্যবস্থা শুধু অর্থনৈতিক বিষয় এবং ব্যক্তিগত লাভ বিবেচনা করে। ইহা বিনিয়োগের সামাজিক দিক ও সামাজিক ক্ষতি অবজ্ঞা করে। সরকারি বিবেচনায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা থাকে না।

রাষ্ট্র বনাম বাজার এই বিতর্কে একটি তাত্ত্বিক দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সমর্থকেরা অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার বিরোধীরা বলেন যে, বাজার ব্যবস্থার ফলে আয়ের বণ্টন অসম হয়। এখন, আয়ের বণ্টন অসম হলে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি হবে কারণ ধনীদের ভোগ প্রবণতা কম এবং সঞ্চয় প্রবণতা বেশি। অন্যদিকে, গরীবের ভোগ প্রবণতা বেশি কিন্তু সঞ্চয় প্রবণতা কম। সেক্ষেত্রে, আয় বণ্টন যত অসম হবে, দেশে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন তত বেশি হবে। ফলে উন্নয়ন হার বেশি হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অসাম্য বেশি। আবার যদি আয়ের সম বণ্টন ঘটে তাহলে সঞ্চয় কম হবে এবং দেশের

বৃদ্ধির হার কম হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমতা বেশি। তাহলে সমতা ও উন্নয়নের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যজনক টানাপোড়েন (trade off) রয়েছে। আবার, আয় বণ্টন খুব অসম হলে দেশীয় বাজার খুব সংকুচিত হতে পারে দরিদ্রদের ভোগ ব্যয় কমে যাওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধাক্কা খেতে পারে। সুতরাং সমতা এবং উন্নয়ন হারের সঠিক সমন্বয় নির্ধারণ করতে হবে। এখানেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রাসঙ্গিকতা। আবার, এটাও মনে রাখা দরকার যে খুব বেশি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হতে পারে। তাই মনে হয় যে, রাষ্ট্রের ভূমিকা কিছুটা সীমিত আকারের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের শুধু পরিকাঠামোগত সুবিধার জোগান দেওয়া প্রয়োজন। এতে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা বাড়বে। তাই রাষ্ট্রের উচিত রাস্তাঘাট, রেলপথ, শক্তি উৎপাদন, সেচ প্রকল্প প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করা। তাহলে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে। সুতরাং রাষ্ট্র বনাম বাজার এই আলোচনার উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, রাষ্ট্র ও বাজারের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক পরিপূরকতার। রাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা দূর করতে বাজার ব্যবস্থার কিছু উপাদান থাকা দরকার। আবার, বাজারের অসম্পূর্ণতা দূর করতে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৬.৮ সমাজতন্ত্রে দাম নিরূপণ

সমাজতন্ত্রে দাম নির্ধারণ একটি বিতর্কিত বিষয়। বাজার ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্রের ন্যায় এখানে চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না। দামকে এখানে উপকরণ বণ্টনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সমাজতন্ত্রে দাম তাই একটি রাজনৈতিক অস্ত্র (instrument) বা হাতিয়ার, দাম এখানে অর্থনৈতিক বিষয় নয়। সমগ্র বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

সমাজতন্ত্রে দাম নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের মূল্য ও দামের (value and price) মধ্যে পার্থক্য জানা দরকার। অর্থনীতিতে এই দুটি পরিভাষা পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীগণ মূল্য কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি হল ব্যবহার মূল্য (use value) এবং অপরটি হল বিনিময় মূল্য (exchange value)। কোনো দ্রব্য ব্যবহার করে ব্যবহারকারী যে তৃপ্তি বা উপযোগিতা পায়, তাই হল দ্রব্যের ব্যবহার মূল্য। বর্তমানে একেই আমরা দ্রব্যের উপযোগিতা বা অভাবমোচনের ক্ষমতা বলে থাকি। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের এক ইউনিটের বদলে অপর কোনো দ্রব্য যত ইউনিট পাওয়া যায়, তাই হল ঐ দ্রব্যের বিনিময় মূল্য। যেমন, এক কেজি চাল দিয়ে যদি ২ কেজি আলু পাওয়া যায়, তাহলে বলা হবে যে, এক কেজি চালের বিনিময় মূল্য হল ২ কেজি আলু। তেমনি, এক কেজি আলুর বিনিময় মূল্য হল আধ কেজি চাল। এই বিনিময় মূল্যকেই সাধারণ অর্থে কোনো দ্রব্যের মূল্য বলে ধরা হয়। এখন, কোনো দ্রব্যের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হলে সেই বিনিময় হারকেই এই দ্রব্যের দাম বলে। সুতরাং কোনো দ্রব্যের দাম হল ঐ দ্রব্যের এক ইউনিটের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হার। আর এই দ্রব্যের মূল্য হল ঐ দ্রব্যের এক ইউনিটের সঙ্গে অপর কোনো দ্রব্যের বিনিময় হার।

এখন, সমাজতন্ত্রে কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারণের ভিত্তি হল মার্ক্স-এর মূল্য তত্ত্ব বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, মার্ক্স-এর মূল্য সম্পর্কে শ্রম তত্ত্ব (labour theory of value)। মার্ক্সের মতে, কিছু কিছু জিনিসের কেবলমাত্র ব্যবহার মূল্য আছে, কিন্তু কোনো বিনিময় মূল্য নেই, যেমন, সূর্যালোক, ঝরণার জল, বন্য ফলমূল প্রভৃতি। মার্ক্স তার মূল্যের আলোচনায় এগুলিকে বাদ দিয়েছেন কারণ ব্যবহার মূল্য একান্তই মানসিক বিষয় এবং ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়। মার্ক্স এদের দ্রব্য (goods) অভিহিত করেছেন। যে সমস্ত জিনিসের ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য উভয়ই আছে, তাদের তিনি বলেছেন পণ্য (commodities)। মার্ক্স পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ব্যবহার মূল্যকে বাদ দিয়েছেন কারণ তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং মনোগত বিষয়। পণ্যের মূল্য নির্ধারণে তিনি তাই বিনিময়মূল্যকেই ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। মার্ক্সের মতে, দুটি পণ্যের মধ্যে বিনিময় হার (অর্থাৎ মূল্য) নির্ধারিত হবে ঐ দুটি পণ্য উৎপাদন করতে ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের পরিমাণের দ্বারা।

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। মনে করি, এক একক চাল তৈরি করতে পাঁচ একক শ্রম লাগে এবং এক একক আলু তৈরি করতেও পাঁচ একক শ্রম লাগে। তাহলে, মার্ক্সের মতে, ঐ দুটি পণ্যের মধ্যে বিনিময় হার হবে :

$$\frac{\text{আলুর শ্রম মূল্য}}{\text{চালের শ্রম মূল্য}} = \frac{5 \text{ ঘণ্টা}}{5 \text{ ঘণ্টা}} = 1 : 1$$

আর একটু জটিল উদাহরণও বিবেচনা করা যেতে পারে। মনে করি, এক একক আলু তৈরি করতে 5 একক প্রত্যক্ষ বা সরাসরি শ্রম লাগে। আর এক একক চাল তৈরি করতে এক একক আলু লাগে কাঁচামাল হিসাবে এবং সরাসরি বা প্রত্যক্ষ শ্রম লাগে 5 একক। সেক্ষেত্রে,

$$\frac{\text{চালের শ্রম মূল্য}}{\text{আলুর শ্রম মূল্য}} = \frac{5 \text{ ঘণ্টা} + 5 \text{ ঘণ্টা}}{5 \text{ ঘণ্টা}} = 2 : 1$$

সুতরাং, আলু ও চালের মধ্যে বিনিময় হার 2 : 1 হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারিত হবে ঐ পণ্যগুলির মধ্যে নিহিত সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমের দ্বারা। সংক্ষেপে এই হল মার্ক্স প্রবর্তিত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব। এখন, এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রে কীভাবে দাম নির্ধারিত হয় তা দেখা যাক।

সমাজতন্ত্রে দাম নির্ধারণ সম্পর্কে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। **প্রথমত,** দামের ভিত্তি উৎপাদন ব্যয়, প্রধানত শ্রম-ব্যয়। **দ্বিতীয়** দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যয় ও চাহিদা উভয় দিক হিসাব করে। প্রথম মতের ভিত্তি হল মার্ক্স-এর মূল্য সম্পর্কে শ্রম তত্ত্ব। আমরা জানি, মার্ক্সের মূল্য সম্পর্কে শ্রম তত্ত্ব অনুসারে কোনো জিনিসের মূল্য নির্ভর করে তার মধ্যে নিহিত ও সামাজিকভাবে

প্রয়োজনীয় শ্রমের (socially necessary labour) পরিমাণের উপর। মার্ক্স-এর মূল্য তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় নীচের সূত্রটি দ্বারা :

পণ্যের মূল্য = C + V + S যেখানে C = স্থির মূলধনের জন্য ব্যয়

V = পরিবর্তনীয় মূলধনের জন্য ব্যয় (অর্থাৎ মজুরি)

S = উদ্বৃত্ত মূল্য

সমাজতন্ত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের নাম সমাজের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য, অর্থাৎ যে উদ্বৃত্ত বা মুনাফা সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। এখন, আমাদের সূত্রের C কে তেমন অদলবদল করা যায় না। সেক্ষেত্রে V যত কম রাখা যায়, S তত বেশি বাড়নো যায়। S বাড়াতে না পারলে সমাজে মূলধন গঠন দ্রুতহারে সম্ভব নয়। তাই সমাজতন্ত্রে সাধারণত দাম স্থির করা হয় এমন স্তরে যেখানে দামের মধ্যে (C + V) কম থাকে এবং S যথাসম্ভব বেশি থাকে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতন্ত্রে দাম মূলধন গঠনের অস্ত্র। দাম এখানে রাজনৈতিক বিষয়; ইহা অর্থনৈতিক বিষয় বা শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

উপরের সূত্র থেকে আর একটি ধারণা আমরা পেতে পারি যাকে মার্ক্সীয় অর্থনীতিবিদেরা বলেন উৎপাদনী দাম বা production price। এক্ষেত্রে C + V-এর সঙ্গে S-এর সুনির্দিষ্ট অনুপাত স্থির করে দিলে তাকে বলা হয় উৎপাদনী দাম। অর্থাৎ, উৎপাদনী দাম = C + V + r (C + V) = (1 + r) (C + V) যেখানে r হল (C + V)-এর সঙ্গে S-এর অনুপাত অর্থাৎ S = r (C + V)। (C + V) এর সঙ্গে যত বেশি S যোগ করা হবে অর্থাৎ r-এর মান যত বেশি হবে, উৎপাদনী দাম তত বেশি হবে। এই r-এর সঙ্গে ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার mark up মূল্যের পার্থক্য আছে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার (বিশেষত অলিগোপলির) বাজারে বিক্রেতা এই mark up ঠিক করে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করে। সেই বিষয়গুলি হল বাজারের অবস্থা, বিক্রেতার দ্রব্যটির সুনাম, প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির শক্তি, বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের সম্ভাবনা প্রভৃতি। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এই r বা বাড়তি mark up-এর মান নির্ধারণ করে পরিকল্পনা রচয়িতারা। সেখানে r-এর মান উপর থেকে চাপানো। এটি অনেকাংশে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্বারা চালিত। সমাজতন্ত্রে দাম তাই আরোপিত দাম বা প্রশাসনিক দাম। এখানে দাম নির্ধারণে অর্থনৈতিক বিষয়ের তেমন ভূমিকা নেই।

৬.৮.১ সমাজতন্ত্রে দাম নির্ধারণে সমস্যা ও তার সমাধান

শ্রমের ভিত্তিতে মূল্য নিরূপণ করার মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে প্রয়োগ করার অনেক সমস্যা আছে। **প্রথমত,** সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতিতে প্রধান কাঠামোগত অনুপাতগুলি (যেমন, ভোগ ও সঞ্চয়ের অনুপাত, কৃষি ও শিল্পের অনুপাত, বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের মধ্যে অনুপাত প্রভৃতি) স্থির হয় রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য। সুতরাং, অর্তনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকরণ বণ্টনের কাজে দামকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রম-মূল্য অনুযায়ী দাম নিরূপণ করতে গেলে উদ্বৃত্ত মূলের অনুপাতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত শ্রম সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিক হতে হয়। কিন্তু সব রকমের শ্রম সমান ধরনের নয়, সব শ্রমের

দক্ষতাও সমান নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তুলনা করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম খুব কম রাখা দরকার। কিন্তু শ্রমমূল্য অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করতে গেলে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম খুব বেশি হয়ে পড়বে।

চতুর্থত, সাধারণভাবে বলা যায় যে, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দাম বেশি হবে এবং সহজলভ্য দ্রব্যের দাম কম হবে। এখন, কেবলমাত্র শ্রমভিত্তিক দাম নির্ধারণ করলে দেখা যাবে যে, অনেক সহজলভ্য দ্রব্যের দাম বেশি রাখতে হচ্ছে এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দাম কম হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে এটি কার্যকর করা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে মার্ক্সের শ্রম তত্ত্ব অনুসরণ করে কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আসলে মার্ক্সের প্রাচীন ও রক্ষণশীল অনুগামীরা কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারণে চাহিদার প্রভাবকে কার্যত অস্বীকার করতেন। প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণা তাঁরা একেবারেই বর্জন করেছিলেন, কারণ তাঁদের মতে এই ধারণা ভাববাদী, মানুষের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। দ্রব্যের মধ্যে নিহিত শ্রমই মূল্যের ভিত্তি বলে তাঁরা মনে করতেন। সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ধনবিজ্ঞানীরা মার্ক্সের এই তত্ত্বটিকে একটু বদলে নিয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল যে দাম (price), মূল্য (value) দ্বারা নিরূপিত হবে না, এটা স্থির হবে উৎপাদনী দাম (production price) দিয়ে, কারণ এই উৎপাদনের দামের মধ্যে নিহিত থাকে সামাজিক ব্যয়।

অর্থনীতিবিদ উইলজিনস্কি মনে করেন যে, বাস্তবে পরিকল্পনা রচয়িতারা বা সরকারি কর্তৃপক্ষ দাম নির্ধারণে "মূল্য" অথবা "উৎপাদনী দাম" কোনো দিকেই মনোযোগ দেননি। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে বিশেষ কতকগুলি লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে। আমরা জানি যে, সমাজতন্ত্রে দামের ভূমিকা বা কাজকর্ম মূলত পাঁচটি : (i) হিসাব রক্ষণ, (ii) ব্যালান্স তৈরি, (iii) উৎসাহ দান, (iv) কল্যাণের মাত্রা নির্ধারণ এবং (v) উপকরণের বণ্টন। মূলত এই পাঁচটি উদ্দেশ্যেই সমাজতন্ত্রে দামের ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছে। অতীতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দাম নিরূপণের ব্যাপারটিকে কখনোই গুরুত্ব দেননি। উপকরণের বণ্টন এবং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ব্যালান্স রচনা, সমাজের কল্যাণের পরিমাপ করা, কোনো অর্থনৈতিক প্রতিনিধিকে উৎসাহ বা শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি কাজে তাঁরা দামকে ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিক কালে তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রামাণিক দাম বা অনুমিত দামের (standard price) উপর। বর্তমানে দ্বিস্তরভিত্তিক দাম ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে দাম নিরূপণের কোনো একটি একক মাপকাঠি গৃহীত হচ্ছে না। উইলজিনস্কির মতে, এই ব্যবস্থা মার্ক্সীয় শ্রম মূল্য তত্ত্বের বিরোধী। তিনি বলেছেন, সমাজতন্ত্রে বাস্তবে কোনো বিশেষ দ্রব্যের বহু সংখ্যক, যেমন, এক ডজনের বেশি, দাম থাকতে পারে; বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দাম নিরূপিত হতে পারে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে দাম একটি রাজনৈতিক বিষয়, অর্থনৈতিক বিষয় নয়। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই এখানে দামকে ব্যবহার করা হয়।

৬.৯ সামাজিক দ্রব্য ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ

যে দ্রব্য কোনো ব্যক্তিকে জোগান দিলে অন্য কোনো ব্যক্তিও বাড়তি কোনো ব্যয় ছাড়াই ঐ দ্রব্য ব্যবহার করতে পারে, সেই দ্রব্যকে সামাজিক দ্রব্য বা সরকারি দ্রব্য (Social good or Public good) বলে। স্যামুয়েলসনের মতে, বিশুদ্ধ সামাজিক দ্রব্য হল সেই দ্রব্য (i) যা ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবং (ii) যার ভোগের ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না (non-rival and non-excludable)। এর অর্থ হল, দ্রব্যটি একবার জোগান দেওয়া হলে কাউকে সেই দ্রব্য ভোগ করা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। সরকারি বা সামাজিক দ্রব্যের উদাহরণ হল জাতীয় প্রতিরক্ষা, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, সরকারি পার্ক, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি।

সামাজিক দ্রব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনতা (non-rivalness) : ভোগের ক্ষেত্রে সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের ভোগ বাড়ালে অন্য ব্যক্তির ঐ দ্রব্যের ভোগ কমে না।

২. বঞ্চনাহীনতা বা অবিযুক্ততা (non-excludability) : সামাজিক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে অবিযুক্ত। এর অর্থ হল, যদি দ্রব্যটি ভোগের জন্য জোগান দেওয়া হয়, তাহলে কাউকে সেই দ্রব্যের ভোগ থেকে বঞ্চিত করা বা অবিযুক্ত রাখা যায় না। ফলে কেউ কেউ দ্রব্যটি বিনামূল্যে ভোগ করার চেষ্টা করে। একে বিনি পয়সায় বা মুফতে ভোগের সমস্যা (free-rider problem) বলে। কোনো কোনো ব্যক্তি সরকারি দ্রব্য সম্পর্কে নিজেদের পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষা গোপন রেখে এরূপ সুবিধা নেবার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি বিনি পয়সায় বা মুফতে সরকারি বা সামাজিক দ্রব্য ভোগ করে তাকে মুফতভোগী বা free rider বলে।

৩. ভোগের অবিভাজ্যতা (Consumption indivisibility) : সরকারি বা সামাজিক দ্রব্য সাধারণত অবিভাজ্য। এগুলি যৌথভাবে এবং সাধারণত সম পরিমাণে সমাজের সকলে ভোগ করে। যেমন, জাতীয় নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার সুবিধা অবিভাজ্য।

৪. ভোগকারীর পছন্দ-নিরপেক্ষ (Non-dependence on preference of consumers) : জনগণের যৌথ কল্যাণের জন্য সরকারি বা সামাজিক দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। ভোগকারীর বা ব্যবহারকারীর পছন্দ-অপছন্দের উপর ভিত্তি করে সেগুলি তৈরি হয় না। যেমন, কোনো রাস্তা নির্মাণ কেবল একজন ব্যক্তির পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে না।

৫. উৎপাদন অবিভাজ্যতা (Production indivisibility) : সরকারি দ্রব্য ক্ষুদ্র পরিমাণে বা ক্ষুদ্র আকারে তৈরি হয় না। আবার, সেগুলি সামান্য পরিমাণে বাড়া-কমা করা যায় না। যেমন, কোনো সেতু নির্মাণ করতে হলে তার পুরোটাই নির্মাণ করতে হয়। সেতুটির আংশিক নির্মাণ করলে তা কোনো কাজে আসে না।

৬. বৃহৎ এবং একলপ্তে উৎপাদন (Large and lump production) : সরকারি দ্রব্য সাধারণত বৃহৎ পরিমাণে এবং এক লপ্তে উৎপাদন করতে হয়। তা না হলে এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেমন,

কোনো রাস্তা তৈরি হলে তা বেশ বড় দৈর্ঘ্যের হতে হবে। মাত্র কয়েক মিটার রাস্তা কোনো কাজে আসবে না।

৭. ভোগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা (Non-discrimination in consumption) : সরকারি বা সামাজিক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে ভোগকারীদের মধ্যে কোনো বিভেদ বা পার্থক্য করা হয় না। যেমন, কোনো সেতু বা রেলের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার।

৮. ব্যয় ও ব্যবহারের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কহীনতা (Absence of any relation between cost and use) : সরকারি দ্রব্যের কোনো ব্যবহারকারী অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্রব্যটি সমানভাবে ভোগ করে। ঐ ব্যক্তি সরকারি দ্রব্যটির জন্য যতই ব্যয় বহন করুক না কেন, ভোগের ক্ষেত্রে তার বাড়তি অধিকার নেই। যেমন, কোনো পার্ক তৈরি করতে কোনো ব্যক্তি বেশি চাঁদা দিলেও পার্কটি সকলের সঙ্গে সে সমান ভোগ করতে পারে।

৯. ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of control on use) : সরকারি বা সামাজিক দ্রব্যের ব্যবহারে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলে ঐ দ্রব্যটির অতি ব্যবহারের দ্রব্যটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী এবং দার্শনিক গ্যারেট হার্ডিন একে সাধারণের দ্রব্যের করুণ পরিণতি বা tragedy of commons বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, অতি ব্যবহারে সাধারণের তৃণভূমি, মাছের জলাশয় প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। সেক্ষেত্রে মালিক দ্রব্যটি এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে তা অদূর ভবিষ্যতে নষ্ট না হয়ে যায়।

৬.১০ সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের কাম্য সরবরাহ

সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের কাম্য সরবরাহ নির্ধারণ করার পূর্বে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কাম্য সরবরাহের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয় তা আমরা প্রথমে আলোচনা করবো। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি দ্রব্য সেই বিন্দু পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় যেখানে ঐ দ্রব্যের মোট চাহিদা ও মোট জোগান পরস্পর সমান হয়। মনে করি, বাজারে দুজন ক্রেতা আছে : ক্রেতা 1 ও ক্রেতা 2। তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা যথাক্রমে D_1 ও D_2। এই D_1 ও D_2 কে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা মোট বা বাজার চাহিদা রেখা D পাই (চিত্র ৬.১)। মনে করি S হল মোট বা বাজার জোগান রেখা। চিত্রে এই দুই রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং, E বিন্দুতে D = S এবং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। তখন বাজার দাম হল OP_0। এই

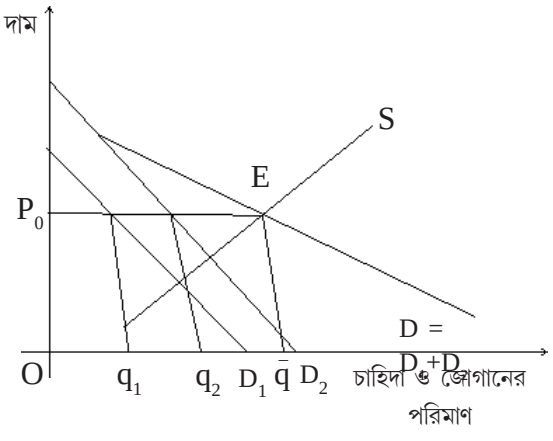

দামে 1নং ক্রেতা Oq_1 পরিমাণ এবং 2নং ক্রেতা Oq_2 পরিমাণ ক্রয় করবে। স্পষ্টতঃই $Oq_1 + Oq_2 = O\bar{q}$ = মোট জোগান।

এখন, সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের কাম্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ণয় করা যাক। মনে করি, প্রথম ক্রেতা ও দ্বিতীয় ক্রেতার সরকারি দ্রব্যের চাহিদা রেখা যথাক্রমে D_1 ও D_2 (চিত্র ৬.২)। আমরা অনুমান করছি যে, উভয় ক্রেতাই সরকারি দ্রব্যের জন্য দাম প্রদানের ইচ্ছা সঠিকভাবে প্রকাশ করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কেউই মুফতে দ্রব্যটি পেতে অর্থাৎ free rider হতে ইচ্ছুক নয়। এখন, সরকারি বা সামাজিক দ্রব্য প্রতিদ্বন্দ্বীহীন (non-rival)। দ্রব্যটির একজনের ব্যবহারের ফলে অন্যের ব্যবহার কমে না। সুতরাং, D_1 ও D_2 কে উল্লম্বভাবে যোগ করে আমরা সরকারি দ্রব্যের মোট চাহিদা রেখা P (= $OP_1 + OP_2$) পাই। এই রেখা জোগান রেখা S কে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তখন সরকারি দ্রব্যের কাম্য পরিমাণ হল Oq_1 বা Oq_2 বা $O\bar{q}$। তখন 1ত্রনং ক্রেতা দাম দেয় OP_1 এবং 2নং ক্রেতা দাম বহন করে OP_2। এখানে $OP_1 + OP_2 = O\bar{P}$। এখানে সরকারি বা সামাজিক দ্রব্যের ব্যয়ের সবটাই ব্যবহারকারীর নিকট তোলা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ লিনডাল (Lindahl) সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ দাম নির্ধারণের সুপারিশ করেন। অর্থাৎ সরকারি দ্রব্যের ব্যয়ের সবটাই ঐ দ্রব্যের ব্যবহারকারীরা বহন করবে। তাই E বিন্দুকে বলা হয় Lindahl ভারসাম্য বিন্দু এবং OP_1 ও OP_2 হল Lindahl দাম।

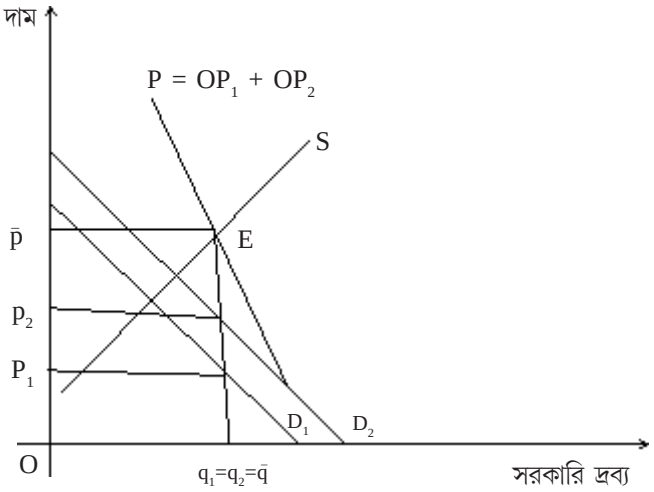

চিত্র ৬.২

৬.১১ সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

সরকার বিভিন্ন সামাজিক দ্রব্য জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করে। সেগুলির দাম হিসাবে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে। এই করের মাধ্যমে সংগৃহীত আয়ের মাধ্যমেই সরকার সামাজিক দ্রব্যের ব্যয় নির্বাহ করে। জনসাধারণের কাছ থেকে কী হারে কর নেওয়া হবে অর্থাৎ সামাজিক দ্রব্যের কীরূপ দাম নেওয়া হবে সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে আমরা তিনটি প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করতে পারি। সেই তিনটি তত্ত্ব হল : (i) সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি, (ii) সুবিধার নীতি এবং (iii) সামর্থ্যের নীতি। এই তিনটি তত্ত্ব নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(i) সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি (Cost of Service Principle) : এই নীতিতে বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে সরকার যে সেবাকার্য দিয়ে থাকে, সেই সেবাকার্য দেওয়ার জন্য সরকারের যে ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ ব্যয়ই ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে কর আকারে সংগ্রহ করা উচিত। অন্যভাবে বলতে গেলে, সরকার কোনো একজন ব্যক্তির জন্য যতখানি অর্থ ব্যয় করবে, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই ব্যক্তির কাছ থেকে কর বা দাম হিসাবে আদায় করবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে সরকারের যা ব্যয় হবে, ঠিক ততটাই কর হিসাবে উঠে আসবে। ফলে সরকারের সেবাকার্যের ব্যয়েরও ঠিকঠাক সংস্থান হবে। সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়লে করের পরিমাণও সমান আয়তনে বাড়বে। ব্যয়ের পরিমাণ কমলে করের বা আয়ের পরিমাণও সমানভাবে কমবে।

কিন্তু এই তত্ত্বটি বাস্তবে প্রয়োগ করার কতকগুলি অসুবিধা আছে।

প্রথমত, সরকার যে সমস্ত সেবাকার্য দান করে, সেই সেবাকার্যগুলি অনেক ব্যক্তি একসঙ্গে ভোগ করে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য সরকারকে কতটা ব্যয় করতে হল, তা পৃথকভাবে জানা যায় না। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতির পরিসেবা আমরা একসঙ্গে ভোগ করি। পৃথকভাবে কে কতটা ভোগ করি তা নির্ণয় করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব পীড়নমূলক। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কর নিলে ধনীর তুলনায় দরিদ্রকে বেশি কর দিতে হবে। সরকারি সেবাকার্যের সুবিধা দরিদ্র জনসাধারণ বেশি পরিমাণে ভোগ করে থাকে। দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে সরকার অধিক অর্থ ব্যয় করে থাকে। সেক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অনুযায়ী, দরিদ্র জনসাধারণকে বেশি কর দিতে হবে এবং তাদের উপর করের বোঝা বেশি হবে। সেটি কখনোই কাম্য নয়।

তৃতীয়ত, কর হল কোনো প্রতিদান পাবার শর্ত না রেখে সরকারের নিকট জনগণের বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদান। সরকার যে কর আদায় করে, তার বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কিছু সেবাকার্য দিতে সরকার বাধ্য নয়। সুতরাং, সেবার বিনিময়ে সরকার কর আদায় করে না।

(ii) সুবিধা বা উপকারের নীতি (Benefit Principle) : এই নীতি অনুযায়ী, দেশের জনগণ সরকারের কাজকর্ম থেকে যেরূপ সুবিধা ভোগ করবে, সেই অনুপাতে তারা সরকারকে কর প্রদান করবে। যে ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে বেশি সুবিধা পাবে, সেই ব্যক্তিকে বেশি কর দিতে হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে কম সুবিধা পাবে, সেই ব্যক্তিকে কম কর দিতে হবে। এভাবে প্রত্যেকে যদি সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা উপকারের অনুপাতে কর প্রদান করে, তাহলে সমতার নীতি বজায় থাকবে।

কিন্তু এই নীতিটিরও কিছু অসুবিধা আছে। **প্রথমত,** সরকারি কার্যকলাপ থেকে কে কতটা সুবিধা পেল তা পৃথকভাবে এবং সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, ত্রাণ প্রভৃতি সেবাকার্য থেকে আমরা অবশ্যই উপকৃত হই, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ঠিক কতটা উপকার পাচ্ছে তা অর্থের মাধ্যমে

পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতির ন্যায় এই নীতিতে কর আদায় করা হলে ধনীদের তুলনায় গরীবের উপর করের ভার বেশি হবে। গরীবেরাই সরকারি কাজকর্ম থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা ভোগ করে। সুতরাং, এই তত্ত্বে সমতার নীতি লঙ্ঘিত হয়।

তৃতীয়ত, কোনো ব্যক্তি সরকারি কাজকর্ম থেকে কতটা সুবিধা বা উপকার পেল তা মানসিক উপলব্ধির বিষয়। এটিকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। তা ছাড়া, এই সুবিধা বা উপকারের বোধ ব্যক্তিভেদে পৃথক হবে, কেননা এটি ব্যক্তির রুচি, পছন্দ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আর প্রতিটি ব্যক্তির রুচি, পছন্দ ইত্যাদি পৃথক।

(iii) সামর্থ্যের নীতি (Ability to Pay Principle) : এই নীতিতে বলা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সামর্থ্য বা ক্ষমতা অনুযায়ী কর দেবে বা সামাজিক দ্রব্যের দাম দেবে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করেন যে, সামর্থ্য অনুযায়ী কর দিলে করের বোঝা সমাজে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হবে। এক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতার নীতি বজায় থাকবে। ধনীর কর প্রদানের সামর্থ্য বেশি। সুতরাং, সামর্থ্যের নীতি অনুযায়ী কর আরোপ করলে ধনীর উপর করের ভার বেশি হবে এবং গরীবের উপর করের ভার কম হবে।

বর্তমানে কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা হয় আয়ের ভিত্তিতে। কিন্তু আয়ের মাপকাঠির দ্বারাও কর প্রদানের ক্ষমতা সর্বদা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। তা ছাড়া, এই তত্ত্ব অনুযায়ী ধনীকে উচ্চহারে কর দিতে হয়। এতে তার অধিক উপার্জনের উৎসাহ কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশের মোট আয়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সুবিধার নীতি (ও সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি) এবং সামর্থ্যের নীতির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের অবস্থানই চরম (extreme) অবস্থান। সুবিধার নীতি এবং সেবাকার্য ব্যয়ের নীতি কর নির্ধারণে শুধুমাত্র সুবিধার পরিমাণ পরিমাপ করতে চায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির করপ্রদানের সামর্থ্য একদমই বিবেচনা করা হয় না। অন্যদিকে, সামর্থ্যের নীতিতে কর নির্ধারণে শুধুমাত্র ব্যক্তির কর প্রদানের সামর্থ্যই বিচার করা হয়, ব্যক্তি কতটা সুবিধা সরকারি দ্রব্য থেকে পেল তা বিচার করা হয় না। সুতরাং উভয় নীতিই বিপরীত চরম অবস্থান গ্রহণ করেছে। বাস্তবে কর নির্ধারণের বা সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময় ব্যক্তির সামর্থ্য ও ব্যক্তির সুবিধা প্রাপ্তি উভয়ই বিবেচনা করা উচিত।

৬.১২ সারাংশ

১. অর্থনীতির প্রধান শিখরসমূহ (Commanding Heights of the Economy) : কোনো অর্থনীতির প্রধান শিখরসমূহ বলতে সেই দেশের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝায়। এই শব্দবন্ধটির ব্যবহার প্রথম দেখতে পাই 1917 সালের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

পর। দেশের বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি বোঝাতে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়। ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির সময় মূল ও ভারী শিল্প বোঝাতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা (Role of State in Economic Development) : কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্র নিম্নলিখিত কার্যসমূহের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করতে পারে : মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ ও তার উপযুক্ত ব্যবহার, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, পরিবেশ রক্ষা, মূলধনি দ্রব্য ও ভোগ্য দ্রব্যের শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, ঘাটতি অর্থসংস্থান, মানব মূলধনে বিনিয়োগ, উপযুক্ত রাজস্ব নীতির দ্বারা জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি, শিশু শিল্প সংরক্ষণ, বিদেশি মূলধন ও প্রযুক্তি সংগ্রহ প্রভৃতি।

৩. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজারের ভূমিকা (Role of Market in Solving Economic Problems) : কোনো দেশের মৌলিক বা কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যা তিনটি : (i) কী কী দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, (ii) কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং (iii) কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মতে বাজার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে এই তিনটি সমস্যার সমাধান করে থাকে। যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বেশি, সেগুলির দামও বেশি। সুতরাং, সেই দ্রব্যগুলিই বেশি বেশি উৎপাদন করা হবে। আবার, সেগুলি উৎপাদন করতে যে সমস্ত উপাদান লাগে, তাদের মধ্যে যেগুলির দাম কম, সেগুলিই বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে উৎপাদন করা হবে। আর এই উপাদানের ব্যবহারের পরিমাণ ও তার দাম দ্বারাই উপাদান মালিকের আয় নির্ধারিত হবে। বাজার ব্যবস্থার সমর্থকেরা এর কতকগুলি সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন, প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা দক্ষতম হয়, ভোগকারী ও বিনিয়োগকারীর সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা থাকে, উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়, সরকারি দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা থাকে না প্রভৃতি।

৪. বাজারের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Role of Markets) : বাজার ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন, অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সম্পদের দক্ষ বণ্টন ঘটে না, অনেক সময়ই ক্রেতারা বিক্রেতার দ্বারা শোষিত হয়, অকাম্য কিন্তু লাভজনক দ্রব্যের উৎপাদন বেশি হয়, আয় বণ্টনের বৈষম্য ঘটে, আয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রজনিত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, বিজ্ঞাপন ও প্রচার কৌশলের দ্বারা ক্রেতার পছন্দকে প্রভাবিত করা হয় ইত্যাদি।

৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা (Role of Economic Planning) : উন্নত অথবা অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংক্ষেপে পরিকল্পনার সুফলগুলি হ'ল নিম্নরূপ : ইহা বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা নিয়ন্ত্রিত করে, আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমায়, দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে কাম্য ব্যবহারে নিয়োগ করে, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করে, দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করে স্ববহনক্ষম উন্নয়নে সাহায্য করে ইত্যাদি। এছাড়া অনুন্নত

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেগুলি হল : বড় আকারের বিনিয়োগের দ্বারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে সাহায্য করা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, দেশে মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা, দেশের সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া ও সেই সঞ্চয় সংগ্রহ করা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা ও বিদেশি প্রযুক্তি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি আমদানি করা, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি।

৬. রাষ্ট্র বনাম বাজার (State Versus Market) : রাষ্ট্র বনাম বাজার এই বিতর্কে অর্থনীতিবিদেরা প্রধানত দুটি শিবিরে বিভক্ত। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীগণ এবং পরবর্তীকাল ফ্রিডম্যানের নেতৃত্বে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদগণ এবং যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যাশার প্রকল্পের তাত্ত্বিকরা বাজার ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধী। অন্যদিকে, বাণিজ্যবাদী এবং প্রকৃতিবাদীগণ এবং পরবর্তীকালে কেইন্‌স্ ও কেইন্‌সীয় অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছেন। এঁরা সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুরোপুরি বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার বিরোধী। যাঁরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্র বা সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের যুক্তিগুলি হল : রাষ্ট্র বা সরকারের অদক্ষতা, বিদেশি মূলধন নিরুৎসাহিত হওয়া, আমলাতন্ত্রের প্রসার, সম্পদের অপবণ্টন প্রভৃতি। যাঁরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চান, তাঁদের যুক্তিগুলি হ'ল : বাজারের অপূর্ণতা দূরীকরণ, আয় বণ্টনে অধিকতর সাম্য, জনকল্যাণ বৃদ্ধি, পরিবেশ রক্ষা প্রভৃতি। আমরা বলবো যে, রাষ্ট্র ও বাজারের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, বরং পরিপূরকতার সম্পর্ক। রাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা দূর করতে বাজার ব্যবস্থার কিছু উপাদান থাকা দরকার। আবার, বাজারের ত্রুটি দূর করতে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৭. সমাজতন্ত্রে দাম নিরূপণ (Pricing under Socialism) : সমাজতন্ত্রে দাম একটি রাজনৈতিক বিষয়। তাই এখানে দাম অর্থনৈতিক বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কোনো বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের দাম কোনো একটি ব্যবহারে ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি রাখা যেতে পারে। আবার, অন্য কোনো ব্যবহারে ঐ একই দ্রব্যের দাম কম ধার্য করা হতে পারে। সমাজতন্ত্রে দাম বিশেষ রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার।

৮. সামাজিক দ্রব্য ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Social Goods and their Characteristics) : যে দ্রব্য কোনো ব্যক্তিকে জোগান দিলে অন্য কোনো ব্যক্তিও বাড়তি কোনো ব্যয় ছাড়াই ঐ দ্রব্য ব্যবহার করতে পারে সেই দ্রব্যকে সামাজিক দ্রব্য বা সরকারি দ্রব্য বলে। সামাজিক দ্রব্যের প্রধান বৈশিষ্টগুলি হল : প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনতা, বঞ্চনাহীনতা বা অবিযুক্ততা, ভোগের অবিভাজ্যতা, উৎপাদনে অবিভাজ্যতা, ভোগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা প্রভৃতি।

৯. সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের কাম্য সরবরাহ (Optimum or Efficient Provisioning of Public or Social Good) : ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কাম্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয়

মোট চাহিদা ও মোট জোগানের সমতার দ্বারা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা মোট বা বাজার চাহিদা রেখা পাই। এই মোট চাহিদা রেখা ও মোট জোগান রেখার ছেদবিন্দুতে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি দ্রব্যের কাম্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। সরকারি বা সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও মোট চাহিদা ও মোট জোগান রেখার ছেদবিন্দুত ঐ দ্রব্যের কাম্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। তবে সরকারি বা সামাজিক দ্রব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। দ্রব্যটির একজনের ব্যবহারের ফলে অন্যজনের ব্যবহার কমে না। তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে উল্লম্বভাবে যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। এই বাজার বা মোট চাহিদা রেখা এবং মোট জোগান রেখা যেখানে ছেদ করে, সেখানেই সামাজিক বা সরকারি দ্রব্যের কাম্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

১০. সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ (Pricing of Social Goods) : সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণের প্রধান নীতি হল দুটি। একটি হল সুবিধার নীতি এবং অপরটি হল সামর্থ্যের নীতি। সুবিধার নীতিতে বলা হয় যে, সামাজিক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের দাম দেবে। এই নীতির প্রধান অসুবিধা হল যে, এর ফলে দরিদ্র ব্যক্তিকে সামাজিক দ্রব্যের জন্য অনেক বেশি দাম বা কর দিতে হবে। অন্যদিকে, সামর্থ্যের নীতির বক্তব্য হল যে, ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক দ্রব্যের দাম দেবে। এক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিকে অনেক বেশি দাম বা কর দিতে হবে। এর ফলে ঐ ব্যক্তির বাড়তি উপার্জনের তাগিদ বা কর্মস্পৃহা কমে যেতে পারে। আমরা বলবো, সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময় দ্রব্যটি থেকে ব্যক্তির প্রাপ্ত সুবিধা এবং ব্যক্তির কর বা দাম প্রদানের ক্ষমতা উভয়ই বিবেচনা করা দরকার—কোনো একটিকে বাদ দিয়ে নয়।

৬.১৩ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. অর্থনীতির উচ্চ শিখরসমূহ বলতে কী বোঝায়?
২. সোভিয়েত উন্নয়নে NEP-র পুরো নাম কী?
৩. সোভিয়েত রাশিয়ার NEP-র কার্যকাল কী?
৪. সোভিয়েত রাশিয়ায় সামরিক সাম্যবাদের কার্যকাল বলুন।
৫. অদৃশ্য হস্ত কাকে বলে?
৬. দাম ব্যবস্থার অপর নাম কী?
৭. কোনো অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা সমস্যাবলি কী কী?
৮. বাজার ব্যবস্থার দুটি সুবিধার উল্লেখ করুন।
৯. বাজার ব্যবস্থার দুটি প্রধান ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা বলুন।
১০. মার্ক্সের মূল্যের শ্রমতত্ত্বের মূলকথা কী?

১১. অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সমর্থনে দুটি যুক্তি দিন।

১২. অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিপক্ষে দুটি যুক্তি দিন।

১৩. সামাজিক দ্রব্য কাকে বলে?

১৪. সামাজিক দ্রব্যের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

১৫. মুফতে ভোগ করার সমস্যা (free rider problem) বলতে কী বোঝেন?

১৬. সাধারণের দ্রব্যের করুণ বা বিয়োগান্ত পরিণতি (tradegy of commons) বলতে কী বোঝেন?

১৭. সমাজতন্ত্রে উৎপাদনী দাম (Production price) বলতে কী বোঝায়?

১৮. সমাজতন্ত্রে শ্রমের ভিত্তিতে দাম নিরূপণের একটি সমস্যা উল্লেখ করুন।

১৯. সরকারি বা সামাজিক দ্রব্যের কাম্য সরবরাহের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয়?

২০. সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণের নীতিগুলির নাম বলুন।

২১. সরকারি দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতির মূলকথা কী?

২২. সরকারি দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সুবিধা বা উপকারের নীতির মূল বক্তব্য কী?

২৩. সামাজিক দ্রব্যের দাম বা কর নির্ধারণে সামর্থ্যের নীতির মূলকথা কী?

২৪. সামাজিক দ্রব্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. অর্থনীতির প্রধান শিখর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করুন।

৪. উন্নত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫. মার্ক্স প্রবর্তিত মূল্যের শ্রম তত্ত্বটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৬. মার্ক্সের শ্রম তত্ত্ব অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করার বাস্তব কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ করুন।

৭. সামাজিক দ্রব্য কাকে বলে? সামাজিক দ্রব্যের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

৮. সামাজিক দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সুবিধার নীতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৯. সামাজিক দ্রব্যের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কর আরোপের সামর্থ্যের নীতিটি বিবৃত করুন।

১০. সামাজিক দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয় তা চিত্র সহযোগে বুঝিয়ে দিন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি :

১. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজার ব্যবস্থার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

৩. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৪. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্র বনাম বাজারের ভূমিকা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

৫. সমাজতন্ত্রে কোনো দ্রব্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করুন।

৬. সামাজিক দ্রব্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন। আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব (২০০২) : রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

২. ভট্টাচার্য, হরশংকর ও বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জি (১৯৮৮) : সোভিয়েটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তারপর, ক্যালকাটা বুক হাউস

৩. Desai, M. (1979) : Marxian Economics, Basic Black well.

৪. Sarkhel, Jaydeb (1997) : An Introduction to Marxian Economics, Book Syndicate Private Limited.

৫. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্ত (2020) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

NOTES

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support".

— Subhas Chandra Bose

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Price : Rs. 250.00

(**NSOU**-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006